মানুষের ইতিহাস

আদি যুগ

4559/7.1.89

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI of all Schools of West Bengal Vide T.B. No. VI/H/79/144, dated 13.12.79.

মানুষের ইতিহাস

আদি যুগ

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

শ্রীবিভাসচন্দ্র মিত্র এম. এ., বি-টি., ডিপ্-ইন্-এড্ (লীডস),

প্রধান শিক্ষক, মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন্ (মেইন), কলিকাতা

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ

শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল

ক্যালকাটা বুক হাউস

১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ জুন, ১৯৭৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৯

পুনর্মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮০

পুনর্মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮২

পুনর্মুদ্রণ ঃ আগস্ট, ১৯৮৪

মূল্য ঃ আট টাকা

"Paper used for printing the book was made available by the Govt. of India at a concessional rate."

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীবিপ্লব ভাওয়াল

প্রেস্টিজ প্রিন্টার্স

২, রামনাথ বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৭০০০০৯

SYLLABUS OF HISTORY
CLASS VI

	No. of Pages	Lessons
HISTORY OF ANCIENT CIVILISATION		
1. A. (i) Why we should read history ; (to be acquainted with human civilisation, its development).	1	1
(ii) How we come to know of ancient people?	2	1
B. **EARLY MAN**		
Use of fire as early as 300,000 B.C. (by 'Peking Man)' ; Food-gathering man.		1
Old Stone Age : Nature of tools and implements, their uses.		1
New Stone Age : (By 8000 B.C.) Evolution of tools and implements, Man—a food producer.		2
The Neo-lithic revolution consisted also of domestication of animals ; invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling—stone houses with defences ; early transport ; beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-painting, etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity.	6	4
	(For 'B' as a whole)	
C. **COPPER-BRONZE AGE** :		
Emergence of towns ; changes in production—specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reasons of the growth of River-Valley Civilisation.	4	3
D. **THE EARLY CIVILISATIONS**		
(3000 B.C.—1500 B.C.) Mesopotemia, Egypt, Indus Valley, China—in outlines.		

	No. of Pages	Lessons
(i) **Mesopotemia** : (a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas ; (b) Fertility of the soil, crops ; (c) Defence against floods ; (d) Other occupations ; (e) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.	5	4
(ii) **Egypt** : (a) Location and nature of the land : (b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax-collectors and 'soldiers' (workers) ; (c) Trade ; (d) The Pyramids (examples) ; (e) Religious beliefs ; (f) Chief occupations.	7	6
(iii) **The Indus Valley** : (a) The discoveries (brief reference to locations and findings) ; (b) Town planning ; (c) Food and other articles of use ; (d) Crafts ; (e) Trade ; (f) Worship ; (g) Light thrown by relics upon classification in society.	7	5
(iv) **China** : (a) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang ; (b) China in early times ; (c) Myths (particularly of flood).	2	1
(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.	3	2
E. **THE IRON AGE SOCIETIES** : (a) Discovery and use of iron, its impact ; (b) Main features of social and economic life ; (c) Growth of Kingship.	2	2
1. (i) **Babylon** : Farming and Commerce ; Temples and Priests ; Learning and Cultures ; The Code of Hamurabi —nature of society revealed by the Code.		3

	No. of Pages	Lessons
(ii) **Egypt as an Imperial power :** Colonies ; The power of priests.		2
(iii) **Iran :** Rise of Persia ; Zoroaster.		
(iv) **The Jews :** Hebrews in Egypt. Hebrew exodus under flight from slavery.	12	2
	(For E as a whole)	
II. **GREECE** (only in broad outlines) : An introductory note on the influence of Crete : The Homeric Age. The City State, cultural interchange, colonisation. Athens and Sparta—their social and political life. Athens Vs. Sparta. Cultural greatness of Athens ; Literature, Arts, Religion—brief reference to a few eminent persons e.g., Pericles, Sophocles, Socrates, Herodotus. Macedon : Alexander—his invasion of India. Fall of the Empire. Roman conquest of Greece.	10	9
III. **ROME** : Origin of Rome. Conflict with Carthage. Early Roman Society : Patricians and Plebeians ; Roman citizenship. Slavery and slave revolts (Spartacus). **Julius Ceaser** : End of Roman Republic. New Empire. Eventual decline and fall. Rise of Christianity.	8	7
IV. **CHINA** : "Great Shang." Confucius—his teachings. Building the Great Wall. The Chin Empire.	3	2
V. **INDIA** : (a) The coming of the Aryans. (b) The Vedas. (c) Early Aryan Society, religion, and political organisation (with reference to the Vedas). (d) The Epics. (e) The rise of Jainism and Buddhism. (f) The Empires—a brief outline of developments from the Mauryas to the Kushanas—		

	No. of Pages	Lessons
to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal up to the decline of the Guptas (on the basis of proven historical materials viz., inscriptions and literary evidence). (h) Foreign contacts (particularly with Central Asia)—their impact upon society and trade. (i) Foreign Travellers—Megasthenes and Fa Hien—general picture of society as revealed in their accounts (in brief outlines only). (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature, education (Taxila and Nalanda), and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).	15	10

F. From the Ancient to the Medieval Era

How the Ancient world opened the gates to the Medieval world. (a) Gradual changes in productive relationships. (b) Slave revolts. (c) Limitations to citizenship and human rights toilets and producers were mere personal effects. (d) Growth and decline of Empires. (e) Rise of lesser potentates. (f) Emergence of feudal economic relations.

* The presentation all through should be made in brief outlines only, and mostly in story-telling style.

* Volume of book—Approx—96 pages.

* No. of Lessons required—approx. 75.

সূচীপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

আমরা ইতিহাস পড়ব কেন?

তোমাদের চেয়ে যাঁরা বয়সে বড় তাঁরা প্রায়ই তোমাদের উপদেশ দেন বড়দের কথা শুনে চলতে। কিন্তু কেন তাঁরা এসব কথা বলেন জান? কারণ তারা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। তাঁরা জগতে অনেক কিছু দেখেছেন এবং জেনেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তারা তোমাদের যে উপদেশ দেন, জেনে রেখো, তা তোমাদের ভালর জন্যেই।

মানুষ শেখে এইভাবেই। আগুনে হাত দিলে যে হাত পোড়ে এই সত্যটি কি আগুনে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে কোনদিন তোমাদের? হয়নি, কারণ ছোটবেলা থেকেই তোমাদের বাবা-মা আগুন সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন তোমাদের।

আদিম যুগে মানুষ হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে বনেজঙ্গলে বাস করত। তাদের সঙ্গে লড়াই করে কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। যারা বেঁচে গেল তারা অপরকে মরতে দেখে শিখল কিভাবে ঐসব বন্য প্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়। তাদের এইসব অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী যুগের মানুষ আরও কিছুটা উন্নত হয়ে উঠল। ক্রমে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখল, সমাজ গড়ল, বনের পশুকে পোষ মানিয়ে চাষ-বাস করতে শুরু করল। এইভাবে পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী যুগের মানুষ ক্রমেই সুসভ্য হয়ে উঠতে থাকল।

মানুষের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। তাই ইতিহাস না পড়লে আমরা জানতেই পারব না কি করে মানবসভ্যতার এই বিরাট অগ্রগতি সম্ভব হোল আর কোন্ কৌশলেই বা আদিম গুহামানবের বংশধর আজ চাঁদের মাটিতে নিজের পায়ের ছাপ রেখে আসতে পারল।

অতীতে সব সময়ে যে মানুষ ঠিক পথে চলেছে এমন নয়। পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক ভুল কাজও করে ফেলেছে সে, আর সেই ভুলের জন্যে খেসারতও তাকে দিতে হয়েছে প্রচুর। ইতিহাস মানুষের এই ভুল ত্রুটি-গুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমাদের। ইতিহাস পড়া থাকলে বার বার একই ভুল করে মানুষকে আর পস্তাতে হয় না ভবিষ্যতে। ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা এইখানেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের উপাদান

প্রাচীন যুগের মানুষের কথা আমরা জানতে পারি কি করে?

কয়েক লক্ষ বছর আগে বন্য পশুদের মধ্যে এক নতুন ধরনের প্রাণী জন্মগ্রহণ করে যারা নিজের চেষ্টায় দুপায়ে ভর দিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে হাঁটতে শিখেছিল। এরাই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ। আজ পৃথিবীতে যে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে তারা সবাই সেই মানুষেরই বংশধর। এই মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য। কারণ তারা পৃথিবীর বুকে এমন কিছুই রেখে যায়নি যা থেকে তাদের সম্বন্ধে আমরা একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। তবে মাটির খুব গভীরে কৃচিৎ কখনও তাদের হাড় পাওয়া গেছে। সেই সব হাড় পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা তাদের চেহারা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমাদের দিতে পেরেছেন। যেমন, তাঁরা বলেছেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিল বেঁটে আর লোমশ। হাতের আঙুল সরু হলেও তাতে শক্তি ছিল প্রচুর। তার কপাল ছিল নিচু আর চোয়াল ছিল বন্য জন্তুদের চোয়ালের মত। ভাগ্যিস্ তাদের দেহের কতকগুলো হাড় পাওয়া গিয়েছিল মাটি খুঁড়ে! তা না হলে পৃথিবীর প্রথম মানুষের চেহারার বিবরণটা পর্যন্ত জানতে পারতাম না আমরা।

আদি মানব

তারপর আরও একটু সভ্য হলে মানুষ গুহায় বাস করতে শুরু করে। ঐ রকম একটা গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে স্পেনে। তার নাম আলতামিরা গুহা। সেইসব গুহায় সে যুগের মানুষ এঁকে রেখেছে নানারকমের ছবি।

ছবিগুলির অধিকাংশই শিকারের। এইসব ছবি থেকে আমরা জানতে পারি তারা কিভাবে শিকার করত, কি পরত, বন্যপ্রাণী শিকার করতে এবং তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে কি ধরনের অস্ত্র তারা ব্যবহার করত ইত্যাদি নানা তথ্য।

আলতামিরা গুহায় আঁকা চিত্র
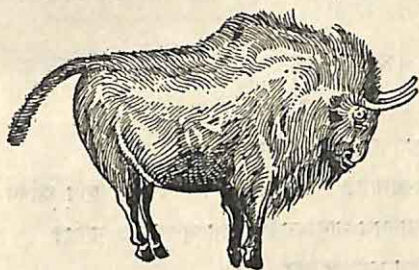
সে যুগের পাথরের তৈরী নানারকম অস্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে কোনটি ভোঁতা আবার কোনটি বা ধারালো এবং পালিশ করা। এ থেকে বোঝা যায় আদিম যুগের মানুষের ভোঁতা বুদ্ধি কিভাবে ক্রমে ধীরে ধীরে ধারালো হয়ে উঠ্ছে।

ক্রমে একদিন মানুষ ধাতু আবিষ্কার করল। ধাতু আবিষ্কারের পর পাথরের তৈরী অস্ত্র ক্রমেই অচল হয়ে পড়ল। শুরু হোল ধাতুর তৈরী আরও তীক্ষ্ণ ও মারাত্মক সব অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া এই সব ধাতুর তৈরী অস্ত্র-শস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পাথরের যুগ শেষ হয়ে পৃথিবীতে ধাতুর যুগ শুরু হয়ে গেছে।

লেখা আবিষ্কারের আগে মানুষ ছবি এঁকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করত অপরের কাছে। তারপর একদিন বর্ণমালার সাহায্যে মানুষ লিখতে শেখে। এই সব অদ্ভুত ছবি ও লিপি সে যুগের মানুষ খোদাই করে রেখেছিল মন্দিরের গায়ে, প্রাসাদের প্রাচীরে, শীলমোহরে আর অসংখ্য মাটির পাত্রে ও ছাঁচে। এইরকম বহু ছবি ও লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে মিশর, মেসোপটেমিয়া, সুমের, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। আধুনিক বর্ণমালার সঙ্গে ঐসব লেখায় ব্যবহৃত বর্ণমালার কোন মিল নেই। তাই বহুদিন পর্যন্ত ঐ সব লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি। আজ থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে কয়েকজন পণ্ডিত বহু চেষ্টা করে কয়েকটি লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন আর তার ফলেই আমরা জানতে পেরেছি সে যুগের মানুষ কি চিন্তা করত, কিভাবে তারা রাজ্যশাসন করত, ভগবান সম্বন্ধে তাদের ধারণা কি ছিল ইত্যাদি অনেক মূল্যবান তথ্য।

পৃথিবীর নানা জায়গায় মাটি খুঁড়ে বহু পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এগুলি থেকেও আমরা প্রাচীন যুগের মানুষের বহু খবর জানতে পারি।

অনুশীলনী

১। মানুষ শেখে কি ভাবে?

২। আদিম মানুষ কি ভাবে বন্য প্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখেছিল?

৩। ইতিহাস বলতে কি বোঝায়?

৪। ইতিহাস পড়লে আমাদের কি সুবিধে হবে?

৫। পৃথিবীর প্রথম মানুষ দেখতে কেমন ছিল?

৬। তাদের চেহারার বিবরণ আমরা জানতে পারলাম কি করে?

৭। আলতামিরা গুহা কি এবং কোথায়? সেই গুহায় কি ধরনের ছবি আঁকা আছে? সেই আঁকা ছবি থেকে আমরা আদিম মানুষের কি পরিচয় জানতে পারি?

৮। পাথরের অস্ত্র আর ধাতুর অস্ত্রের মধ্যে তফাত কি?

৯। লেখা আবিষ্কারের আগে মানুষ কি ভাবে নিজের মনের ভাব অপরের কাছে প্রকাশ করত?

১০। কোন্ কোন্ জিনিস থেকে আমরা আদিম মানুষের কথা জানতে পারি? কোথায় কোথায় ওগুলি পাওয়া গিয়েছে এবং কিভাবে তা আবিষ্কৃত হয়েছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদি মানব

ভূমিকা

আদি মানুষ যখন পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করে তখন কিন্তু পৃথিবী আজকের মত এত শান্ত ছিল না। প্রায়ই চলত পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা। কখনও মাসের পর মাস ধরে তুষারপাত, কখনও বা একনাগাড়ে বৃষ্টি। কোথাও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আর ভূমিকম্প, আবার কোথাও বা বনের শুক্‌নো কাঠে কাঠে ঘষা লেগে দাবানল পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে সব কিছু। এই আগুন দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছে বনের জন্তু-জানোয়ার থেকে শুরু করে আদিম মানুষ পর্যন্ত। ভয়ে এক বন থেকে অন্য বনে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে তারা। আবার একনাগাড়ে তুষারপাতের সময় অন্য কোথাও পালাতে না পেরে এদেরই অনেকে প্রাণ হারিয়েছে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে।

আগুনের ব্যবহার

পৃথিবীর আদিম মানুষ আগুনের ব্যবহার যতদিন না জেনেছে ততদিন আগুনকে তারা কেবল ভয় করেই চলেছে। কবে যে মানুষ প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখল সে কথা নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। চীন দেশের পিকিং শহরের কাছে চৌ-কু-টিয়েন নামে এক আদি মানুষের গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গুহায় যারা বাস করত, বিজ্ঞানীদের মতে তারা প্রায় তিন লক্ষ বছর আগের মানুষ। এই গুহার মধ্যে পাওয়া গেছে কয়েকটি পোড়া হাড়ের টুকরা। এর থেকে অনুমান করা হয় ঐ গুহায় যারা বাস করত তারা নিশ্চয় আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। এরা পিকিং ম্যান বা পিকিং-এর মানুষ নামে পরিচিত। এর আগের কোন মানুষের আগুন ব্যবহারের নজির আর কোথাও পাওয়া যায়নি বলেই এই পিকিং-এর মানুষই পৃথিবীর প্রথম আগুন ব্যবহারকারী মানুষ হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। হিমবাহের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বনের সমস্ত জন্তু-জানোয়ার যখন একে একে প্রাণ হারাচ্ছিল তখন মানুষ বুদ্ধির জোরে আগুনকে কাজে লাগিয়ে শীতে জমে যাওয়া থেকে রক্ষে পেয়েছিল।

এই আগুনের ব্যবহার মানুষকে সভ্যতার পথে অনেকদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। একদিন তাদের শিকার করা একটা পাখী হঠাৎ তাদের গুহার মধ্যে রাখা আগুনে পড়ে গিয়ে ঝলসে যায়। তারপর

সেই ঝলসানো মাংস তারা মুখে দিয়ে দেখল অপূর্ব তার স্বাদ। সেই থেকে মানুষ আবিষ্কার করল খাবার জিনিস কাঁচা না খেয়ে রান্না করে খেলে অনেক বেশি ভাল লাগে।

আগুনের ব্যবহার শেখার পর থেকে মানুষ আর আগুনকে ভয় করে না। কিন্তু আগুনের ভয় জন্তু-জানোয়ারদের আজও কাটেনি। এতে আদিম মানুষের খুব সুবিধে হোল। তারা রাতে গুহার মুখে আগুন জ্বেলে রাখতে শুরু করল। তাতে ঠাণ্ডায় গুহাটাও বেশ গরম হয়ে থাকত আর সেই আগুন দেখে বনের জন্তু-জানোয়ারেরাও আর ভয়ে সেদিক মাড়াত না। এইভাবে আগুনের ব্যবহার মানুষকে হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতির সঙ্গে আদিম মানুষের এই লড়াই-এ এই সত্যই প্রমাণিত হোল যে, যার বুদ্ধি আছে সেই কেবল জগতে টিঁকে থাকতে পারে।

খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ

সে যুগের মানুষকে প্রতিপদে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তাদের সে লড়াই ঠাণ্ডার সঙ্গে, খিদের সঙ্গে। আমরা দেখেছি বুদ্ধিবলে ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়াই করে সে জিতেছে। এবার তার লড়াই খিদের সঙ্গে। চাষবাস শেখার পর থেকে মানুষ পৃথিবীকে নিংড়ে তার খাবার সংস্থান করে নিচ্ছে। কিন্তু আদিম মানুষের এই ফসল ফলানোর বিদ্যে জানা ছিল না। আপনা থেকেই বনে যেসব গাছপালা জন্মাত তার ফলমূল খেয়েই তারা পেট ভরাত। নতুন গাছ না পুঁতলে পুরানো গাছ আর কতদিন ফল দেবে? এইভাবে একদিন বনের গাছের ফল সব উজাড় হয়ে গেলে তারা তখন সেই বন ছেড়ে আবার নতুন কোন বনে গিয়ে আশ্রয় নিত। এইভাবে খাদ্যের সন্ধানে যাযাবরের মত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে ঘুরেই পৃথিবীর আদিম মানুষের জীবন কাটত।

অনুশীলনী

১। আদিম মানুষ আগুনকে ভয় করত কেন?

২। পিকিং ম্যান কাদের বলে? তারা কবেকার লোক এবং কোথায় বাস করত? তারা ইতিহাসে কি জন্যে বিখ্যাত?

৩। আগুনের ব্যবহার শেখার পর মানুষের কি কি উপকার হয়েছিল?

৪। আদিম মানুষ যাযাবরের মত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াত কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

ভূমিকা

আজ যেমন আমরা সবাই মিলেমিশে এক জায়গায় বাস করছি প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ কিন্তু সেভাবে বাস করত না। নিজের মাথাগোঁজার সামান্য ঘর পর্যন্ত তারা তখন তৈরী করতে শেখেনি। পাহাড়ের গুহায়, বড় কোন গাছের ডালে তারা বাসা বেঁধে থাকত আর বনের গাছে গাছে ফলমূল যা হোত তাই খেয়েই তারা পেট ভরাত। বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করাই ছিল প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের প্রধান সমস্যা। বন্যপ্রাণীদের তুলনায় হীনবল হলেও মানুষ চিরকালই বুদ্ধিদীপ্ত। শুধু বুদ্ধিবলেই মানুষ অতীতে বনের অতিকায় হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে এসেছে। নতুবা মানুষের অস্তিত্ব কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত পৃথিবীর বুক থেকে।

অস্ত্র ও তার ব্যবহার

মানুষের তুলনায় বনের বড় বড় জন্তু-জানোয়ারদের গায়ের জোর অনেক বেশি। তারা বুঝেছিল শুধু গায়ের জোরে বনের অতিকায় প্রাণীদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। তখন তারা অনুভব করল অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। তারা ভাবল এমন একটা কিছু খুঁজে বার করতে হবে যা দিয়ে বনের জন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা যায়। এই চিন্তা থেকেই মানুষ
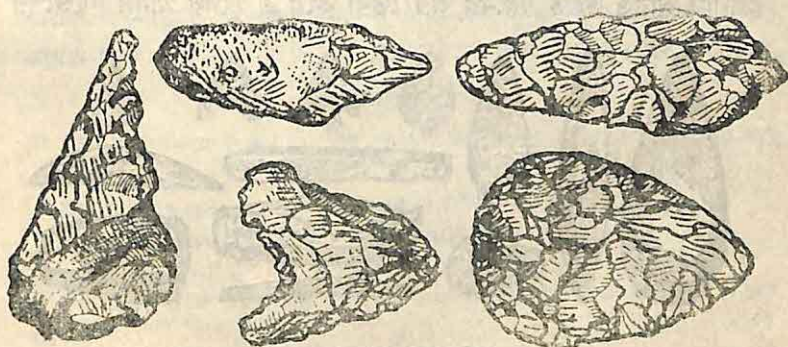
আদিম যুগের মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র

একদিন তার হাতিয়ার আবিষ্কার করল। মানুষ দেখল তার আশেপাশে রয়েছে বহু গাছ আর অসংখ্য বড় বড় পাথরের চাঁই। গাছের কাঠ আর পাথরের চাঁইকে সে অস্ত্র হিসেবে বেছে নিল। কাঠ থেকে বানাল বর্শা

আর গদা। পাথরের চাঁইগুলোকে সামান্য ঘষে মেজে তৈরী করল বেশ কয়েক রকমের অস্ত্র। বড় বড় গাছ বা পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে এই সব অস্ত্র দিয়ে তারা ঘায়েল করত বন্য প্রাণীদের। লড়াই করা ছাড়াও দৈনন্দিন কাজের জন্যেও তাদের নানারকম অস্ত্রের প্রয়োজন হোত। যেমন মাটি খুঁড়তে, গাছ কাটতে চাই শাবল, কুড়ুল ইত্যাদি অস্ত্র। এসবই তারা তৈরী করত পাথর থেকে। প্রাচীন প্রস্তর যুগের এরকম বহু অস্ত্র পাওয়া গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। কাঠ তো আর পাথরের মত অতদিন থাকে না। তাই সে যুগের কাঠের তৈরী কোন অস্ত্রেরই সন্ধান মেলেনি আজ পর্যন্ত।

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে এ যুগের অস্ত্রগুলো সবই একটু মোটা ধরনের আর আকারেও বেশ বড়। বেশ বোঝা যায় পরের যুগের অস্ত্রের মত এযুগের অস্ত্র অত সূক্ষ্ম, মসৃণ আর ধারালো নয়। কথায় আছে কোন জিনিস হয় ধারে কাটে নয় তো ভারে কাটে। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ তাদের অস্ত্র ভাল করে শানাতে পারেনি বলেই বোধ হয় আকারে বড় করে তৈরী করেছিল যাতে তারা অন্ততঃ ভারে কাটতে পারে।

নব প্রস্তর যুগ

আমরা দেখব নব প্রস্তর যুগে পৌঁছে মানুষ ক্রমে আরও নতুন নতুন শক্তি অর্জন করে চলেছে। আগুন জ্বালাতে শিখে মানুষ যে কত শক্তিধর হয়ে উঠেছিল সে কাহিনী তোমরা আগেই পড়েছ। তারপর আগের তুলনায় আরও উন্নত ধরনের অস্ত্র তৈরী করে এ যুগের মানুষ নিজেদের
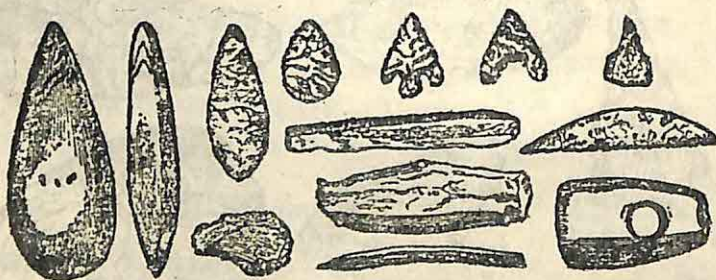
নব প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

আরও শক্তিশালী করে তুলল। তোমরা দেখেছ প্রথম যুগে মানুষের তৈরী পাথরের অস্ত্রগুলো ছিল ভোঁতা। কিন্তু সে তুলনায় নব প্রস্তর যুগের অস্ত্র অনেক বেশি মসৃণ ও ধারালো। তাই আকারে ছোট হলেও এ যুগের অস্ত্র ছিল অনেক বেশি মারাত্মক। কাঠের হাতল লাগানো নব প্রস্তর

যুগের একটা কুড়ুল পাওয়া গিয়েছে। হাতের কাজে তারা যে কত নিপুণ ছিল এই কুড়ুলটি থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

খাদ্য উৎপাদনকারী মানুষ

আজ থেকে প্রায় দশহাজার বছর আগে নব প্রস্তর যুগের মানুষই প্রথম পৃথিবীতে কৃষিকার্যের সূচনা করে। এতদিন মানুষ বনে-জঙ্গলে পশু-পাখী মেরে আর আপনা থেকে গাছে গাছে ফলে-থাকা ফলমূল খেয়েই নিজের পেট ভরিয়েছে। এতদিন সে ছিল খুঁটে খাওয়া প্রাণী। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থাকা খাবার আহরণ করেই সে উদর পূর্তি করে এসেছে এতদিন। নব প্রস্তর যুগে পেঁাছে মানুষ প্রথম শিখল খাবার সংগ্রহের জন্যে ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে এক জায়গায় থেকে কি করে নিজের খাবার নিজে তৈরী করে নিত হয়।

মানুষ যখন প্রথম জমি থেকে ফসল ফলাতে শুরু করে তখনও কিন্তু তারা জমিতে লাঙ্গল দিতে শেখেনি। তারা লক্ষ্য করেছিল গাছের বীজ থেকে কি করে চারা গাছ বেরোয়। তখন থেকে তারা গাছের বীজ সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখতে শুরু করে। তারপর সময়মত সেই বীজ ছড়িয়ে দিত জমিতে। পৃথিবীতে প্রথম চাষ-আবাদের সূচনা হয় এই-ভাবেই। এই কৃষিবিদ্যা আবিষ্কারের পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মানুষ কিন্তু শুধু চাষ-বাসের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারেনি। চাষ-বাসের সঙ্গে সঙ্গে আগের মত পশু-পাখী শিকার ও ফলমূল আহরণের কাজও সমানে চালিয়ে গেছে তারা। তারপর চাষ-বাসের কাজে হাত যখন বেশ ভালভাবে পেকে উঠ্‌ল তখন থেকেই তারা এক জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং কষিকার্য হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রধান উপজীবিকা।

অনুশীলনী

১। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের প্রধান সমস্যা কি ছিল? সেই সমস্যার সমাধান তারা কিভাবে করেছিল?

২। হিংস্র পশুদের সঙ্গে সে যুগের মানুষ কি ভাবে লড়াই করত?

৩। কিভাবে এবং কি কি উপাদান দিয়ে তারা অস্ত্র তৈরী করত?

৪। প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নব প্রস্তর যুগের তৈরী অস্ত্রের মধ্যে তফাত কি ছিল?

৫। যেটি সঠিক উত্তর তার পাশে ($\surd$) এবং যেটি ভুল তার পাশে ($\times$) চিহ্ন দাও।

(ক) পিকিংম্যান আলতামিরা গুহায় বাস করত।

(খ) পিকিংম্যান প্রথম আগুনের ব্যবহার শেখে।

(গ) প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ বন্যপ্রাণীর ন্যায় একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াত।

(ঘ) নব প্রস্তর যুগের মানুষ গাছের বীজ জমিয়ে রাখত খাবে বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নব প্রস্তর যুগের বিপ্লব

ভূমিকা

বিপ্লব বলতে মারামারি কাটাকাটিকে বোঝায় না। বিপ্লব বলতে বোঝায় দ্রুত কোন পরিবর্তন। আগেই তোমরা পড়েছ আদি প্রস্তর যুগ থেকে নব প্রস্তর যুগে পেঁাছে মানুষ বুদ্ধিবলে অনেক কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে। তারা ইতিমধ্যে অনেক কিছু জেনেছে এবং শিখেছে যা তার আগের যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। এইসব নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে নব প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনধারা গেল সম্পূর্ণ পাল্টে। মানুষের জীবনযাত্রায় এই যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেল একেই বলে বিপ্লব। এইবার আমরা দেখব কোন্ কোন্ আবিষ্কার কি কি পরিবর্তন এনে দিয়েছিল নব প্রস্তর যুগের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে।

চাষ-বাস

নব প্রস্তর যুগের মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হ'ল চাষ-বাস। চাষ-আবাদ শেখার আগে খাদ্যের সন্ধানে মানুষকে যাযাবরের মত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। কৃষিবিদ্যা মানুষকে শিখিয়ে দিল এক জায়গায় স্থায়িভাবে বাস করে কিভাবে জমি থেকে নিজেদের খাবার ফসল ফলিয়ে নিতে হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে এই কৃষিকার্যের আবিষ্কারের ফলে মানুষের বন্যজীবন চিরকালের মত শেষ হয়ে গেল। এখন থেকে মানুষের এক এক গোষ্ঠী এক এক জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করল।

পশুপালন

বনে বাস করার সময় মানুষ লক্ষ্য করেছিল বনের সব প্রাণীই হিংস্র নয়। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রাণী আছে যারা অত্যন্ত নিরীহ এবং তারা মানুষের সঙ্গও পছন্দ করে। যেমন, কুকুর, গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি প্রাণী। এইসব নিরীহ প্রাণীদের সঙ্গে একত্র বাস করতে করতে একদিন মানুষ এদের পোষ মানিয়ে ফেলল। এদের মধ্যে মানুষের প্রথম পোষ মানা প্রাণী হচ্ছে কুকুর। তারপর একে একে মানুষের পোষ মানল গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি। প্রাণীদের মধ্যে যারা তৃণভোজী তারাই মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকারে আসে। এরা মানুষকে দুধ আর মাংস

দুই-ই জোগাত। এর আগেই মানুষ পশুর চামড়া পরা শুরু করেছিল শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। এখন তারা পশুর লোম দিয়ে গরম কাপড় বুনতেও শিখে গেল। আজও আমরা গরমের জামা যা পরি তা সব পশুর লোম থেকেই তৈরী। এইভাবে বনের প্রাণীকে পোষ মানিয়ে মানুষ একসঙ্গে খাওয়া ও পরা দুয়েরই সংস্থান করে নিল। এইভাবে কৃষিকার্যের সঙ্গে পশুপালনও হয়ে দাঁড়াল মানুষের আর একটি প্রধান উপজীবিকা।

মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্প

আদিম যুগের মানুষের জল রাখার কোন পাত্র ছিল না। তেষ্টা পেলে নদী বা ঝরনা থেকে জল পান করে আসত। পরে তারা শিখল কি করে মাটির পাত্র তৈরী করে রোদে পুড়িয়ে তা শক্ত করে নিতে হয়। এইসব মাটির পাত্র তারা তখন হাতেই বানাত। কুমোরের চাক দেখেছ? চাকা ঘুরিয়ে কি সুন্দর মাটির হাঁড়ি-কলসি তৈরী করে তারা। মাটির পাত্র তৈরীর জন্যে এইরকম চাকা প্রথম আবিষ্কার করে নব প্রস্তর যুগের মানুষ। এই যুগেরই মানুষ হঠাৎ একদিন তুলো গাছ আবিষ্কার করে তা থেকে সুতো তৈরী করতে শিখে গেল। পশুর লোম থেকে কাপড় বুনতে তারা আগেই শিখেছিল। কিন্তু গরমের পোশাক তো আর বারমাস পরে থাকা যায় না। গরমকালের জন্যে দরকার হয় সূতী পোশাকের। তুলো আবিষ্কারের পরে ক্রমে সূতীবস্ত্র বুনতেও শিখে গেল নব প্রস্তর যুগের মানুষ। এইভাবে চাষ-আবাদ, পশুপালন, মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্পের আবিষ্কারে খাওয়া-পরার দিক থেকে মানুষের রুচিতে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

চিত্রিত মৃৎপাত্র

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

নব প্রস্তর যুগের মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে এক একটা গ্রামে বাস করত। গ্রামে থাকত একটা করে শস্যাগার যেখানে তাদের সকলের বার মাসের খাবার মজুত করা থাকত। তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সবই নিজেরাই তৈরী করে নিত। মাঝে মধ্যেই এই সব গ্রামে বন্যপ্রাণীরা

ঢুকে পড়ে মানুষ মেরে চলে যেত। ভিন্ গাঁয়ের মানুষও অনেক সময়ে খাদ্যের জন্য দল বেঁধে হামলা চালাত অন্য গ্রামের মানুষের ওপর। এইসব ভিন্ গাঁয়ের মানুষের হামলা আর বনের হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে নব প্রস্তর যুগের মানুষ চারদিকে খাল কেটে আর পাথরের উঁচু পাঁচিল তুলে নিজেদের গ্রামকে সুরক্ষিত করে রাখত। নব প্রস্তর যুগের ঐরকম একটি সুরক্ষিত গ্রাম আবিষ্কৃত হয়েছে ইংলণ্ডে। তাতে দেখা যায় গ্রামের মধ্যে কয়েকটি পাথরের বাড়ি আর সেই বাড়ি-গুলোকে বৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে পর পর দুসারি উঁচু পাথরের পাঁচিল আর সব শেষে একটা গভীর খাল। এই পাঁচিল তোলা আর খাল কাটা কোন একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রামের প্রতিটি মানুষের মিলিত পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছিল গ্রামের এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। মানুষ এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে, একতাই শক্তি। তাই তারা এখন থেকে দলবদ্ধ হয়ে এক জায়গায় বাস করতে শুরু করেছে। এইভাবে এক জায়গায় পাঁচজন মিলেমিশে বাস করা থেকেই শুরু হয়েছে মানুষের গোষ্ঠী জীবন।

যান বাহন

আদিম যুগে পরিবহণ-ব্যবস্থা বা যানবাহন বলতে কিছুই ছিল না। দরকার পড়লে মানুষ নিজেই বয়ে নিয়ে যেত নিজের মালপত্তর এক-জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। তারপর মানুষ যখন বন্যপ্রাণীকে পোষ মানাতে শিখল তখন থেকে সে পশুদের দিয়েই মাল বওয়াতে শুরু করল। আগেই পড়েছ মানুষ প্রথম কুকুরকে পোষ মানায়। তাই কুকুরই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম মালবাহী প্রাণী। কিন্তু কুকুর ছোট প্রাণী। সে ভারী মাল টানতে পারে না। তাই পরবর্তী কালে মানুষ যখন আরও বড় বড় প্রাণীকে বশ করল তখন থেকে তারাই মানুষের মাল বয়ে বেড়াতে লাগল। এইভাবে গরু, ঘোড়া, উট, হাতি প্রভৃতি বড় বড় প্রাণীকে মানুষ নিজেদের মাল বওয়ার কাজে বহাল করল। চাকা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত, একটা কাঠের পাটাতনের ওপর মালপত্তরগুলোকে গুছিয়ে বাঁধা হোত এবং তারপর বড় বড় প্রাণীরা সেই পাটাতনটিকে মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেত। চাকা আবিষ্কারের পর যখন মানুষ গাড়ী তৈরী করতে শিখল তখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় মাল চলাচল অনেক সহজ এবং দ্রুত হয়ে গেল। নদী আর সমুদ্রতীরের জায়গাগুলোতে মানুষ নৌকোর ব্যবহার শিখেছে বহু দিন। এক ধরনের ঘাস, নলখাগড়া আর কাঠ দিয়ে প্রাচীন যুগের মানুষ একরকম হাল্কা নৌকো তৈরী করত। সেই নৌকোর সাহায্যেই তারা জলপথে মালপত্তর নিয়ে যাতায়াত করত।

শিল্প

শুধু খেতে পেলেই মানুষের মন ভরে না। সে আরও কিছু চায়। মানুষ সুন্দরের পূজারী। তাই দেখা যায় আদিম যুগ থেকেই মানুষ পরিপাটি করে নিজের ঘর সাজাচ্ছে, নানারকম অলঙ্কার দিয়ে দেহসজ্জা করছে। আদিম মানুষের যে কয়টি গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি দেখলে অবাক হতে হয়। কি সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে তারা গুহাগুলিকে সাজিয়ে রেখেছিল। সে যুগের মানুষের তৈরী হাড় আর পাথরের অলঙ্কারগুলিও দেখবার মত। এই সব গুহাচিত্র আর সূক্ষ্ম কাজ করা অলঙ্কারগুলি আজও আদিম যুগের মানুষের শিল্পজ্ঞান ও রুচিবোধের পরিচয় বহন করছে।

ধর্ম বিশ্বাস

আদিম মানুষের মনে ধর্মের চেতনাও কিছু কিছু জেগেছিল। ধর্ম হ'ল একটা বিশ্বাস। এর উৎপত্তির মূলে ছিল মানুষের মনের ভয়। ঝড়-বাদল, শিলাবৃষ্টি, বাজ-বিজলি, ভূমিকম্প—এইসব প্রাকৃতিক ব্যাপার তারা কিছুই বুঝত না। ভাবত এই সব ভয়ঙ্কর ব্যাপারের পেছনে এমন কেউ নিশ্চয় কলকাঠি নাড়ছেন যাঁর শক্তি অসীম। এই ধারণা থেকেই আদিম মানুষ সেই অদৃশ্য শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে ঘটা করে নরবলি আর পশুবলি দিত।

ভাষার উদ্ভব

প্রথম যুগে মানুষের কথা বলার শক্তি ছিল না। অন্য জন্তুদের মত মানুষও অদ্ভুত আওয়াজ করে একই অর্থহীন কথা বারবার উচ্চারণ করত। ক্রমে সে দেখল এই শব্দ তো সে কাজে লাগাতে পারে। এই শব্দ উচ্চারণ করে সঙ্গীদের আসন্ন বিপদ থেকে সাবধান করে দিতে পারে। তাই সে কয়েকটা ছোট ছোট তীক্ষ্ণ শব্দ করে উঠত যার মানে দাঁড়াত, "ঐ একটা বাঘ!" কিংবা "ঐ একটা হাতির পাল আসছে!" অন্যেরাও ঐ শব্দের উত্তরে কি সব উচ্চারণ করত, তার অর্থ হয়ত, "হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি!" কিংবা, "ভয় নেই আমরা গাছে উঠে পড়েছি!" লক্ষ্য করে থাকবে আজও আমরা অনেক সময় উঃ, আঃ, বাঃ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করে মনের দুঃখ, আনন্দ বা বিস্ময় প্রকাশ করে থাকি। মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে এইরকম ভাবগুলিকে নির্দিষ্ট ভাবে সাজিয়ে গেঁথে নিয়ে শব্দ তৈরী করেছিল। মনে হয় এই ভাবেই ভাষার প্রথম সূত্রপাত হয় পৃথিবীতে।

ঈশ্বর-কল্পনা

চাষ-বাস শুরু করার পর মানুষ লক্ষ্য করল যে, প্রতিবছর তারা সমান ফসল পাচ্ছে না। কোনবার বৃষ্টির অভাবে মাঠের সব শস্য জ্বলে গেল, কোনবার বা অতিবৃষ্টিতে সব পচে নষ্ট হয়ে গেল। তারা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিল যে, সময়মত সূর্যের আলো আর বৃষ্টির জল পর্যাপ্ত পরিমাণে না পেলে ফসল নষ্ট হবেই। কিন্তু বৃষ্টি আর সূর্যের ওপর মানুষের কোন হাত নেই। এরা এক একটা প্রাকৃতিক শক্তি। তাদের ধারণা হোল ভগবান কুপিত হলেই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির মত অঘটন সব ঘটে থাকে। তাই তারা তখন সেই সব প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে দেব-দেবীরূপে পূজো করতে লাগল। ফসল উৎপাদনের পেছনে রোদ আর বৃষ্টির অবদান সবচেয়ে বেশি। এরা অসন্তুষ্ট হলে মানুষের ফসল মার খাবে। তাই মানুষ সূর্য আর বৃষ্টিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে তাদের নিয়মিত পূজো করতে শুরু করল। এইসব পূজোর একটা প্রধান অঙ্গই ছিল বলিদান। নরবলি এবং পশুবলি দুই-ই চলত অবাধে। তারপর সেই বলির মাংসের টুকরো, রক্ত, হাড় নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত সে যুগের চাষীদের মধ্যে। বলির মাংসের যেটুকু পাওয়া যেত তাই তারা অত্যন্ত ভক্তিভরে পুঁতে দিত নিজেদের চাষের জমিতে। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল এতে তাদের জমির ফলন বাড়বে।

অনুশীলনী

১। চাষবাস শেখার ফলে মানুষের কি সুবিধা হোল?

২। পশুপালন মানুষের কি উপকারে লেগেছিল?

৩। প্রাচীন গ্রামের মানুষের ওপর কারা হামলা করত? সেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তারা কি ব্যবস্থা নিয়েছিল?

৪। কি দেখে বোঝা যায় যে সে যুগের মানুষ সুন্দরের পূজারী ছিল?

৫। আদিম মানুষের মনে ধর্মের চেতনা কি ভাবে জেগেছিল?

৬। প্রথম ভাষার সূত্রপাত হয়েছিল কি ভাবে?

৭। মানুষ সূর্য আর বৃষ্টিকে পূজো করত কেন?

৮। জমির ফলন বাড়াবার জন্যে তারা কি করত?

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

(ক) ------ আবিষ্কারের পর পরিবহণ-ব্যবস্থা অনেক সহজ ও দ্রুত হয়ে গেল।

(খ) এইভাবে এক জায়গায় পাঁচজন মিলেমিশে বাস করা থেকেই শুরু হয়েছে মানুষের ------ জীবন।

(গ) প্রাণীদের মধ্যে যারা ------ তারাই মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকারে আসে। এরা মানুষকে ------ আর ------ দুই-ই জোগাত।

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

ভূমিকা

যে যুগে মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জ আবিষ্কার করেছে এবং যতদিন পর্যন্ত তারা ঐ দুটি ধাতুকেই নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহার করে এসেছে সেই যুগকে বলে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ। তামা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত পাথরের তৈরী অস্ত্রই ছিল মানুষের একমাত্র হাতিয়ার। প্রথম যুগে বনের মানুষ সভ্যতার দিক থেকে ছিল অনেক পিছিয়ে। তারা তখনও নিজেদের খাবার পর্যন্ত তৈরী করে নিতে শেখেনি। বনের ফলমূল সংগ্রহ এবং পশু শিকার করেই তারা পেট চালাত। আর এ কাজে পাথরই ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন। ক্রমে মানুষ যতই সুসভ্য হয়ে উঠতে লাগল ততই সে অনুভব করতে থাকল যে, শুধু পাথর দিয়ে তার সব কাজ মিটছে না। পাথরের চেয়ে আরও শক্ত কোন পদার্থ চাই যা দিয়ে সে মাটি খুঁড়ে ফসল ফলাতে পারে, শত্রুকে ঘায়েল করতে আরও ধারালো ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে পারে। তাই দেখা যায় নিজের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ একদিন তামা আবিষ্কার করে ফেলেছে। ক্রমে মানুষ তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ নামে আরও শক্ত এবং মজবুত একটা মিশ্র ধাতু তৈরী করতেও শিখে গেল। এই তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার মানুষকে সভ্যতার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। পাথরের যুগ শেষ হবার পর থেকে লোহা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে যে যুগটা চলে এসেছে তাই ইতিহাসে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ নামে পরিচিত।

শহরের উৎপত্তি

বলা যেতে পারে এই যুগেই মানুষ প্রথম দলবদ্ধ হয়ে এক জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাস করতে শেখে। বিভিন্ন উপজাতির মানুষ বন ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সবাই এসে বসতি স্থাপন করল কোন-না-কোন নদী বা সমুদ্রের উপকূলবর্তী কোন অঞ্চলে। তাই এই যুগেই প্রথম পৃথিবীর বিভিন্ন নদী উপত্যকায় ও সমুদ্রতীরে শহর গড়ে উঠতে দেখা যায়। মিশর, মেসোপটেমিয়া, ফিনিশিয়া, ক্রীট্, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি যে সব প্রাচীন জনপদের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় তা সবই কোন-না-কোন নদী অথবা সমুদ্রতীরে অবস্থিত। নানাধরনের জিনিস তৈরী হোত এই সব শহরে আর বণিকেরা সেই সব জিনিস নৌকো

বোঝাই করে চালান দিত দেশ-বিদেশে। এই ভাবে ঐ শহরগুলি ক্রমে প্রাচীনযুগের এক একটি বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হোল। কালক্রমে ঐ শহরগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এক একটি শক্তিশালী রাজ্য। শুধু তাই নয়, এইসব রাজ্যগুলিকে বলা যেতে পারে মানবসভ্যতার আদি লীলাভূমি। মানবসভ্যতার বিকাশে মিশর, মেসোপটেমিয়া, ফিনিশিয়া, এশিয়া মাইনর, সিন্ধু উপত্যকার মানুষের অবদানের কথা ভুললে চলবে না।

তাহলে আমরা বলতে পারি এই যুগেই আমরা প্রথম দেখলাম মানুষ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়িভাবে বাস করতে শিখেছে। এই যুগেই প্রথম উৎপত্তি হয়েছে শহরের। প্রথম দিকে মানুষ যখন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি স্থাপন শুরু করেছিল তখন দেখা দিল এক চরম বিশৃঙ্খলা। কেউ কারুর কথা শোনে না। সবাই চলতে চায় যে যার খুশী খেয়াল মত। জোর যার মুলুক তার—অনেকটা এই রকম অবস্থা। ক্রমে তারা বুঝতে পারল এইরকমভাবে চললে পরস্পর মারামারি করেই একদিন সব শেষ হয়ে যাবে। তাদের তখন প্রয়োজন হোল একজন নেতার যাঁর কথা শুনে সবাই চলবে, যাঁর নির্দেশে পরিচালিত হবে তাদের সমাজজীবন। তাঁরই পরিচালনায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবে। সুতরাং বলা যেতে পারে যাযাবর জীবনের দুঃখ-কষ্টকে কাটিয়ে একজন যোগ্য নেতার অধীনে মানুষ যাতে সুখে-শান্তিতে একত্র বসবাস করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই একদা গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর প্রাচীন শহরগুলি।

নগর শাসন

এইসব প্রাচীন শহরগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এদের প্রত্যেকটিতে ছিল প্রাসাদ, মন্দির এবং একটি করে শস্যাগার। দলের নেতাই ছিলেন দেশের রাজা। তাঁর অধীনে থাকত বহু কর্মচারী। কেউ কর আদায় করত, কেউ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করত আবার কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্যের তদারক করত। এইসব শহরের অধিকাংশই ছিল উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা যাতে বাইরে থেকে শত্রুরা হঠাৎ শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে লুঠতরাজ চালাতে না পারে। তাই সে যুগে শহরের মধ্যে প্রজাদের জীবন ও ধনসম্পদ ছিল অনেকটা নিরাপদ।

সেচ-ব্যবস্থা

প্রাচীন যুগের মানুষের প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন ছিল খাদ্যের। নীল নদের তীরে যারা বসতি স্থাপন করেছিল তারা নীল নদে খাল কেটে,

বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে জমিতে প্রচুর ফসল ফলাতে লাগল। এই সব ব্যবস্থা নেওয়ার ফলেই নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলে গম আর তুলোর চাষ করা সম্ভব হয়েছিল।

বিভিন্ন শিল্প

সে যুগে তামা আর ব্রোঞ্জ দিয়েই যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরী হোত। ধাতুশিল্পীরা গড়ত এইসব অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি। কাঠ দিয়ে তৈরী হোত আসবাবপত্র ও দু-চাকার রথ। এইসব জিনিস তৈরী করার মত উপযুক্ত কাঠ পাওয়া যেত না মিশরে। তাই সে দেশে কাঠ আমদানী হোত ফিনিশিয়া থেকে। যাবতীয় কাঠের কাজ করত ছুতোরেরা। এ ছাড়া ছিল রাজমিস্ত্রী। ছুতোর আর রাজমিস্ত্রী মিলে তৈরী করত মজবুত সব বাড়ীঘর। তবে স্নানাগার ও পাকা নালি সমেত ইটের তৈরী বাড়ী যা ভারতবর্ষের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তার তুলনা নেই কোথাও। আজকাল কাঠ চেরাইয়ের জন্যে ছুতোরেরা যে করাত ব্যবহার করে সেই ধরনের করাত প্রথম আবিষ্কার করে হরপ্পার লোকেরা আর তার ফলে কাঠের কাজে তারা অনেক উন্নত হয়ে উঠেছিল। হরপ্পায় আবিষ্কৃত শীলমোহর, মাটির খেলনা, ব্রোঞ্জের মূর্তি দেখলে বেশ বোঝা যায় সে যুগের কারিগরেরা ছিল কী সুদক্ষ শিল্পী! খুব সূক্ষ্ম কাজ করার মত শিল্পীরও অভাব ছিল না সে যুগে। সোনা-রূপোর তৈরী গয়না, রঙীন কাজ-করা মাটির পাত্র যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় সে যুগের কারিগরদের শিল্পনৈপুণ্য। সুতরাং বলা যেতে পারে এই যুগের শিল্পীরা মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, কারুশিল্প, বয়নশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য

সে যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করেছিল মিশর, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া-মাইনর এবং সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা। জল এবং স্থল উভয় পথেই চলত এই বাণিজ্য। জাহাজ নির্মাণে ফিনিশিয়রা ছিল খুবই উন্নত। এই কারণেই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য ছিল প্রায় একচেটিয়া। বণিকেরা দ্রব্যের বিনিময়ে জিনিসপত্র কেনাবেচা করত। যেমন ফিনি-শিয়রা মিশরের কাছে কাঠ বিক্রী করে তার বিনিময়ে সেখান থেকে নিয়ে আসত রূপো আর পেপাইরাস গাছের পাতা। সিন্ধু উপত্যকা থেকে রপ্তানি হোত তুলো। দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবসা করার অনেক অসুবিধে।

তাই পরবর্তী কালে মেসোপটেমিয়ার লোকেরা রূপোর পাত মুদ্রা হিসেবে চালু করেছিল। পরে রূপোর মুদ্রা সরকারীভাবে চালু হয় লিডিয়াতে।

পরিবর্তিত সমাজ

ক্রমে জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস করার জন্যে মানুষ আরও নতুন নতুন জমি অধিকার করতে লাগল। এইভাবে সমাজ যতই বড় হতে লাগল ততই নানা পরিবর্তন দেখা দিল সমাজে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের যারা মাথা যেমন রাজা, অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত সম্প্রদায় ইত্যাদির হাতে জমে গেল প্রচুর পয়সা। ফলে তারা তখন ক্রমেই বিলাসী হয়ে উঠ্‌তে লাগল। ইতিমধ্যে প্রচুর ক্ষমতা হাতে পেয়ে রাজা হয়ে উঠেছেন দেশের মধ্যে সর্বেসর্বা। পুরোহিতরাও কম যায় না। সে যুগের সমাজের লোকেরা ছিল ধর্মভীরু। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে পুরোহিতদের কথার প্রতিবাদ করতে কারুর সাহসে কুলোত না। তাই প্রাচীন সমাজের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় পুরোহিতদের প্রাধান্য। তাঁরা দেশের মন্দির এবং সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। এইসব কাজের জন্যে তাঁদের অধীনে থাকত বহু কর্মচারী যারা অন্যান্যদের তুলনায় সমাজে বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করত। সমাজে রাজকর্মচারী-দের স্থান ছিল ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের ওপরে। সমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরে ছিল ক্রীতদাসরা। ধনীব্যক্তিরা বিলাসবহুল প্রাসাদে বাস করত আর শ্রমজীবীদের বাসস্থান ছিল কুঁড়ে ঘরে।

উপজাতীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব

আগেই বলেছি জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপজাতির মানুষের প্রয়োজন হতে লাগল আরও জমির যাতে তাদের সকলের স্থান সংকুলান হতে পারে। এই জমির অধিকার নিয়েই শুরু হোল বিভিন্ন উপজাতির মানুষের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। এইরকম যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়েই মিশরের নীল নদ বরাবর উত্তর-দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দুটি রাজ্য। যুদ্ধ করতে গেলে দরকার হয় অস্ত্রের। তাই দেখা যায়, যে উপজাতির লোকেরা যত ভাল ভাল অস্ত্র তৈরী করতে পারত তারাই তাদের প্রতিবেশীদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। পরাজিতরা বিজয়ীদের ধর্ম গ্রহণ করে সমাজে ক্রীতদাসরূপে বাস করত। দেশের সমৃদ্ধির মূলে ছিল এই সব ক্রীতদাসদের কঠোর পরিশ্রম।

প্রাচীন রাষ্ট্রের উদ্ভব

সব মানুষের বাস করার একটা করে স্থায়ী আস্তানা যখন হয়ে গেল তখনই ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদ। মানুষের এক একটা দল এক এক জায়গায় আস্তানা গেড়েছিল। ভিন্-দেশের মানুষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা নিজের নিজের এলাকা উঁচু পাঁচিলের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখত। তাদের প্রত্যেকের ছিল একজন করে নেতা যিনি ছিলেন অনেকটা রাজার মত। তিনি তাঁর এলাকার মধ্যে সব কিছুই পরিচালনা করতেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচব্যবস্থার তদারকি, কর আদায় প্রভৃতি সব কিছুরই দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। দেশে মন্দিরের কাজ দেখাশোনা করতেন পুরোহিতরা, বণিকেরা ব্যবসাবাণিজ্য করত, চাষীরা চাষ-আবাদ করে কর হিসেবে শস্য জমা দিত সরকারী শস্যাগারে। ক্রীতদাসরা বেগার খাটত আর শিল্পীরা উৎপন্ন করত মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের নানা ধরনের জিনিস। রাষ্ট্রের মধ্যে সাধারণতঃ যে সব ব্যবস্থা থাকে তার প্রায় সব কয়টিই চালু ছিল এই সব প্রাচীন জনপদগুলিতে। এই সব প্রাচীন রাষ্ট্রের শাসকদের অনেকেই হয়ে উঠেছিলেন খুব শক্তিশালী। দেশের শাসক বা রাজার শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আয়তনও ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে লাগল। বলা যেতে পারে তাঁদেরই চেষ্টায় নীলনদের উপত্যকা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী এলাকা এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল প্রাচীন শক্তিশালী রাষ্ট্র।

নদী উপত্যকায় সভ্যতার বিকাশের কারণ

খাদ্য না হলে মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রথম যুগে মানুষ বনের ফলমূল আর শিকার করা পশুর মাংস খেয়ে পেট ভরাত। কালক্রমে মানুষ আরও উন্নত হোল। তারা চাষ-আবাদ ও পশুপালন করতে শিখল। ইতিমধ্যে প্রতিটি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বেড়ে গেছে। তাদের তখন প্রয়োজন হোল আরও বড় জায়গার যেখানে তাদের সকলের এবং তাদের গৃহপালিত পশুর খাদ্যসংস্থান হ'তে পারে। তাই তারা বন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধানে। প্রথম প্রথম তারা যাযাবরের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারা এমন জায়গা খুঁজছিল যেখানে তাদের গৃহপালিত পশুর চরে খাবার মত তৃণভূমি আছে, যেখানে চাষের উপযোগী প্রচুর জল ও রোদ পাওয়া যায়। ঘুরতে ঘুরতে নদীতীরবর্তী অঞ্চলে এসে তারা পেয়ে গেল তাদের মনোমত জায়গা। সেখানে তৃণভূমির

অভাব নেই, সেখানে অভাব নেই রোদ-বৃষ্টির এবং সেখানে নদীর বন্যার জল তীরভূমিকে সবসময়ে করে রেখেছে সুজলা ও সুফলা। এই সব

কারণেই প্রাচীন যুগের যাযাবর মানুষ স্থায়ী আস্তানা হিসেবে বেছে নিয়েছিল নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলিকে। এই জন্যই নীল নদের উপত্যকা, সিন্ধু উপত্যকা এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের উপত্যকা মানবসভ্যতার আদি লীলাভূমি হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে।

অনুশীলনী

১। প্রথম শহর গড়ে উঠেছিল কোন্ অঞ্চলে? শহরের শাসনব্যবস্থা কি রকম ছিল?

২। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কি কি শিল্প গড়ে উঠেছিল?

৩। এ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত কিভাবে?

৪। সমাজে পুরোহিতরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন কি ভাবে?

৫। কি ভাবে প্রাচীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল?

৬। নদী উপত্যকায় প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ কি?

৭। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কাদের একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল? কি কারণে তা সম্ভব হয়েছিল?

৮। কিসের বিনিময়ে তখন বাণিজ্য চলত? মিশরীয়দের সঙ্গে বাণিজ্যে ফিনিশিয়রা কি কি জিনিস আমদানি ও রপ্তানি করত?

৯। সমাজে কত রকমের লোক বাস করত?

১০। কি কারণে উপজাতির মধ্যে যুদ্ধ বাধত?
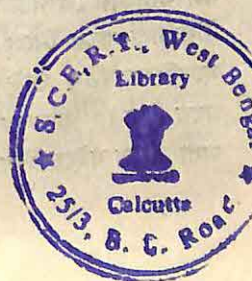
চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন সভ্যতা

মেসোপটেমিয়া

আদিম যুগে বনে মানুষের শিকারী জীবন ছিল খুবই কঠোর। প্রতি পদে ছিল মৃত্যুর হাতছানি। সে তুলনায় কৃষিজীবন ছিল অনেক বেশি নিরাপদ, নির্ঝঞ্ঝাট এবং আরামের। তাই চাষ-বাস শেখার পর বেশির ভাগ মানুষই বনের শিকারী জীবন ছেড়ে চাষ-আবাদে মন দিয়েছিল। চাষ-বাস করতে করতে মানুষের প্রকৃতিও ধীরে ধীরে বদলে গেল। তাদের মনে লাগল নরম মাটির পেলবতার ছোঁয়াচ। অন্যদিকে যারা তখনও বনের শিকারী জীবনকে আঁকড়ে রইল তাদের প্রকৃতি আগের মত দুর্ধর্ষই রয়ে গেল।

যারা কৃষি-জীবনকে বেছে নিল তারা কোথাও স্থায়িভাবে বসতি স্থাপনের উপযুক্ত জায়গার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। চাষ-বাস এবং পশু-পালনের জন্য তাদের প্রয়োজন এমন একটা জায়গা যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পাওয়া যায় বারমাস, যেখানে সূর্য কুয়াসায় মুখ ঢেকে থাকে না বছরের অধিকাংশ সময় এবং যেখানে আছে মানুষের গৃহপালিত পশুর চরে খাবার মত তৃণভূমি।

অবস্থান

সুমের নামে এক পার্বত্য জাতি এইরকম একটা জায়গার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হোল মেসোপটেমিয়ায়। মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ 'নদী ঘেরা ভূমি'। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস এই দুটি নদীর মাঝখানে ছিল এই দেশ। তাই তার নাম মেসোপটেমিয়া। সুমেররা যখন প্রথম এদেশে আসে তখন এই নদী-ঘেরা ভূমিতে ছিল বড় বড় জলা, নল খাগড়ার ঝোপজঙ্গল আর খেজুর বন। তারা দেখেই বুঝেছিল একটু ঠিকঠাক করে নিলে চাষ-বাসের পক্ষে এটা হবে একটা আদর্শ জায়গা। হয়েছিলও ঠিক তাই। তারা প্রথমে এসেই ঝোপজঙ্গল সব কেটে সাফ করে দিল। তারপর জমে-থাকা জলার জলকে খাল কেটে চাষের জমির মধ্য দিয়ে বইয়ে দিল যাতে প্রয়োজনের সময় সেই জল তারা চাষের কাজে

ব্যবহার করতে পারে। আজও আমরা বাঁধের জলকে খাল কেটে চাষের জমির মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে থাকি। ভেবে দেখ মেসোপটেমিয়ার লোকেরা এই সেচ ব্যবস্থা চালু করে গেছে আজ থেকে কত হাজার বছর আগে।

জমির উর্বরতা

চাষের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী জায়গা হ'ল নদী উপত্যকা। নদীতে মাঝে মাঝে বন্যা এসে জমিতে পলিমাটি ফেলে যায়। তাতে জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয় না কোনদিন। তাই দেখা যায় প্রাচীন মানুষেরা চাষ-

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী উপত্যকা

প্রাচীন সভ্যতা

কিলোমিটার 0 ৩২০ ৬৪০
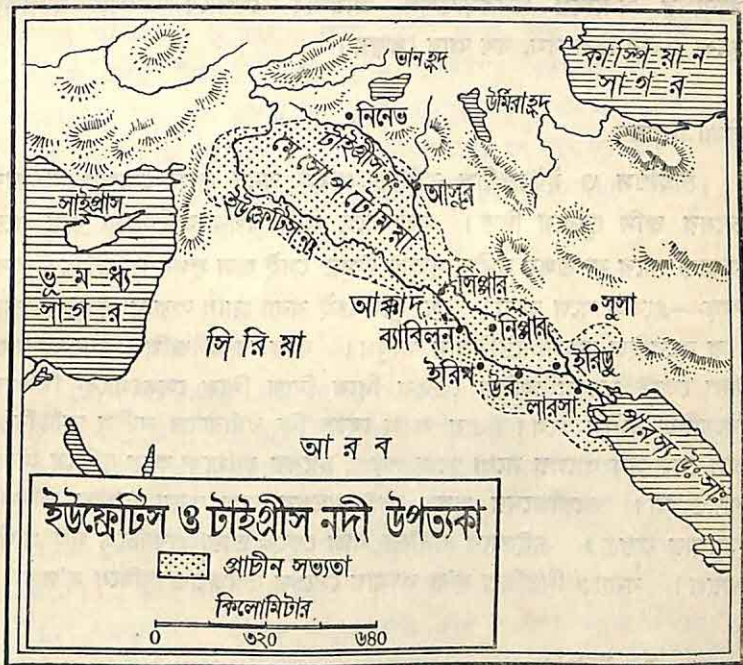
বাসের জন্যে বেছে নিয়েছিল কোন-না-কোন নদী উপত্যকা। এই কারণেই পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মানুষ যখন অর্ধ-সভ্য তখন দেখি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় মেসোপটেমিয়ার মানুষ সব দিক দিয়ে রীতিমত সুসভ্য হয়ে উঠেছে।

মেসোপটেমিয়া দেশটি ছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর পলিমাটি দিয়ে গড়া। পর্যাপ্ত সূর্যের আলো, নদীর জল আর পলিমাটি

মেসোপটেমিয়াকে করে তুলিছিল সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। সোনা ফলত এ দেশের মাটিতে। জমিতে এক মুঠো বীজ ছড়ালে তা থেকে মানুষ একশ' মুঠো ফসল ঘরে তুলত। মানুষ আর কত খেতে পারে। তাই তারা সবাই পেট ভরে খেয়েও অনেক ফসল উদ্বৃত্ত থাকত। আগে মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াত শুধু খাদ্যের সন্ধানে। এদেশে আসার পর তার খাবার অভাব যখন রইল না তখন আর সে এরকম সোনার দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও ঘুরে বেড়াতে যাবে কেন? তাই সুমেররা স্থায়িভাবে বাসা বাঁধল মেসোপটেমিয়ায়। ক্রমে জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে মেসোপটেমিয়া ধীরে ধীরে শহরের রূপ নিতে লাগল। সে যুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় মেসোপটেমিয়াই হয়ে উঠল মানুষের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা। সেখানে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে প্রধান ছিল গম, যব আর খেজুর।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীতে প্রায়ই বন্যা এসে মেসোপটেমিয়ার চাষের জমি ডুবিয়ে দিত। বর্ষাকালে নদী যখন অতিরিক্ত জল ধরে রাখতে পারে না তখন নদীর দুকূল উপ্‌চে সেই জল দুপাশের জমিতে ঢুকে পড়ে—একেই বলে বন্যা। সে যুগে এই বন্যা রোধ করার একটা উপায় বার করেছিল মেসোপটেমিয়ার মানুষ। তারা জলা জমি থেকে অসংখ্য খাল কেটে চাষের জমির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে সেগুলোকে মিশিয়ে দিয়েছিল নদীর সঙ্গে। এর ফলে হোত কি বর্ষাকালে নদীর অতিরিক্ত জল সেই সব খালের মধ্যে ঢুকে পড়ত, চাষের জমিকে আর ডুবিয়ে দিতে পারত না। প্রয়োজনের সময় সেই খালের জল তারা চাষের জমিতে ব্যবহার করত। এইভাবে নদীতে খাল কেটে তারা একঢিলে দুই পাখী মারল। বন্যাও নিয়ন্ত্রিত হ'ল আবার সেচের কাজেরও সুবিধে হ'ল।

অন্যান্য উপজীবিকা

যখন আট দশ ঘর মানুষ একটা ছোট জায়গায় বাস করত তখন 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ' যাবতীয় নিজের নিজের কাজ নিজেদেরই করে নিতে হোত। যেমন খাওয়ার জন্যে চাষের কাজ, পরার জন্যে বোনার কাজ এবং থাকার জন্যে ঘরামীর কাজ—এসবই একহাতে কোরত সে যুগের মানুষ। ক্রমে সমাজ যখন বড় হয়ে গেল, জনসংখ্যা বেড়ে গ্রাম যখন ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হতে শুরু করল তখন একজনের পক্ষে

আর যাবতীয় কাজ করে ওঠা সম্ভব হোত না। তাই দেখতে পাই মেসোপটেমিয়া যখন ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন মানুষের খাওয়া, থাকা, পরা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি জিনিসের জন্যে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প। আগেই বলেছি মেসোপটেমিয়ায় যে ফসল উৎপন্ন হোত তা সবাই পেট ভরে খেয়েও উদ্বৃত্ত থাকত বেশ কিছু। তাই আগের মত সকলকেই আর চাষের কাজে হাত লাগাতে হোত না। বেশ কিছু মানুষ এখন অন্য কাজে নিজেদের হাত পাকাবার সুযোগ পেল। এইভাবে সমাজের মধ্যে গড়ে উঠল কামার, কুমোর, তাঁতী, ছুতোর, ঘরামী ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়। এরা নিজেদের কাজের বিনিময়ে অপর সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করত তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। যেমন, তাঁতী তার হাতে বোনা কাপড়ের বিনিময়ে চাষীর কাছ থেকে নিয়ে আসে খাদ্যশস্য, কুমোরের কাছ থেকে হাঁড়ি, কলসী, ঘরামীকে দিয়ে ছাইয়ে নেয় নিজের ঘরের চাল ইত্যাদি। তোমরা হয়ত' ভাবছ আজকের মত সে যুগের মানুষ টাকা-পয়সার বিনিময়ে জিনিসপত্তর কেনাবেচা করত না কেন। তার কারণ হোল সে যুগে মুদ্রাব্যবস্থা তখনও চালু হয়নি। তাই জিনিসের বিনিময়ে জিনিস কেনাবেচা হোত। এই ব্যবস্থাকে বলে 'বিনিময় প্রথা'।

সুমের সভ্যতার নিদর্শন

মেসোপটেমিয়ার এই সুমের সভ্যতার নিদর্শন বহু দিন উঁচু মাটির ঢিবির নীচে চাপা পড়ে ছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকা অঞ্চলে। সেই মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে উঁচু মিনার, কৃত্রিম পাহাড় আর বড় বড় দেবদেবীর মন্দির। সেখানে নিপ্পুর নামে এক জায়গা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে পোড়া ইটের তৈরী মস্ত বড় এক মিনার। তাদের এক দেবতা ছিলেন। তাঁর নাম এনলিল। সেই দেবতার উদ্দেশে ঐ মিনারটি তারা তৈরী করেছিল। ইরেক নামে আর এক জায়গা থেকে পাওয়া গেছে আর একটি বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এটি তাদের দেবী 'ইনান্নার' মন্দির। মন্দিরটি লম্বায় ২৪৫ ফিট এবং চওড়ায় ১০০ ফিট। মন্দিরটির পেছনে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে ৩৫ ফিট উঁচু একটা কৃত্রিম পাহাড়। এ মন্দিরটিও মাটি আর রোদে শুকনো ইট দিয়ে তৈরী। সেই মন্দিরের ইটের পাঁচিলের সঙ্গে গাঁথা আছে সুন্দর সুন্দর অসংখ্য পোড়ামাটির কাজ। মন্দিরের ভেতরের অংশ পাইন কাঠের দরজা জানালা, রূপো, তামা আর বহুমূল্যবান রত্নরাজি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো।

ব্যবসা-বাণিজ্য

এই সব মন্দিরের মধ্যে অনেক কিছুই দেখা গেছে যেগুলি মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া যেত না। যেমন, পাইন কাঠ, রূপো, তামা এবং দামী দামী সব পাথর। পণ্ডিতদের অনুমান এ সবই বাইরে থেকে আমদানি করা। তারা ভেড়ার লোম দিয়ে কাপড় বুনত আর নানারকমের পণ্যের বোঝা নিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত। এ থেকে বেশ বোঝা যায় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সে যুগের মানুষ রীতিমত পটু হয়ে উঠেছিল। স্থলপথে উটের পিঠে আর জলপথে নৌকোয় করে চলত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। নদী থেকে তারা দেশের মধ্যে যে অসংখ্য খাল কেটেছিল সেই খাল দিয়ে নদীতে তারপর নদী থেকে সাগরপারে পর্যন্ত পাড়ি দিত তারা নিজেদের সওদা নিয়ে।

আগেই বলেছি মেসোপটেমিয়া হচ্ছে পলিমাটির দেশ। এখানে শক্ত পাথর মেলে না কোথাও। তাই সুমেররা এ দেশে আসার পর প্রথম প্রথম তাদের সমস্যা হোল তারা বাড়ী ঘর তৈরী করবে কি দিয়ে। সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল মাটি থেকে ইট তৈরী করতে শেখার পর। তাই দেখা যায় মেসোপটেমিয়ার মাটি খুঁড়ে বাড়ী, ঘর, মন্দির যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রায় সবই ইটের তৈরী।

ধাতু শিল্প

সুমেররা এতদিন পাথরের অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু মেসোপটেমিয়ায় পাথর পাওয়া যায় না। সুতরাং আবার এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। ইতিমধ্যে মানুষ কয়েকটি ধাতুর ব্যবহার শিখে ফেলেছে। মেসোপটেমিয়ায় তামা না পাওয়া গেলেও সুমেররা জানত এর গুণাগুণ। তামা দিয়ে অস্ত্র তৈরী করতে পারলে তা যে পাথরের অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত, অনেক বেশি ধারালো এবং অনেক বেশি টেঁকসই হবে তা তারা বুঝতে পেরেছিল। তাই পাথর ছেড়ে তারা তামার অস্ত্র তৈরী করতে শুরু করল। তামা তারা আমদানি করত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে। মাটি খুঁড়লেই খনি থেকে তামা পাওয়া যায় না। খনির মধ্যে মাটি-কাঁকরের সঙ্গে মেশানো থাকে তামা। সেই মাটি-কাঁকর থেকে তামাকে আলাদা করে বার করা বড় সহজ কথা নয়। এর জন্যে চাই বিশেষ জ্ঞান। সেই যুগে মেসোপটেমিয়ার ধাতুশিল্পীরা এই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিল। শুধু তাই নয় তামাকে গলিয়ে পিটিয়ে তা থেকে নানারকম অস্ত্র, বাসনপত্র ইত্যাদি তৈরী করত তারা। তা ছাড়া

তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে আরও শক্ত এক মিশ্রধাতু তৈরী করতেও তারা শিখেছিল। বংশপরম্পরায় একই কাজ করে করে এই সব ধাতুশিল্পীরা নিজেদের কাজে হাত পাকিয়েছিল। ধাতু দিয়ে তারা নানারকম জিনিস তৈরী করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন কাজে তা ব্যবহৃত হতে থাকে। এইভাবে মেসোপটেমিয়ার সমাজে ধাতু ক্রমে একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী হয়ে দাঁড়াল।

লিখন পদ্ধতি

সভ্যতার দিক থেকে যারা এত উন্নতি করেছিল তারা কি লিখতে জানত না? নিশ্চয়ই জানত। তারা তাদের লেখার নমুনা রেখে গেছে অসংখ্য কাদা-মাটির ফলকের ওপরে। তখন কাগজ আবিষ্কার হয়নি। মিশরের লোকেরা তাদের লেখা লিখে গেছে পেপিরাস গাছের পাতার
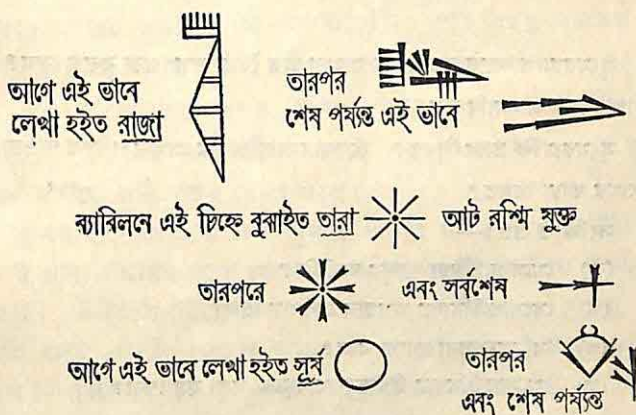
বাণমুখো লিপি

ওপর। কিন্তু মেসোপটেমিয়ায় পেপিরাস গাছও পাওয়া যায় না। তাই তারা লিখত কাদা-মাটির ফলকের ওপর। লেখা হয়ে গেলে ঐ ফলক-গুলিকে রোদে শুকিয়ে নিত তারা। প্রথমদিকে তাদের লেখাও ছিল অনেকটা ছবির আকারের। কিন্তু ঐভাবে লিখতে অনেক সময় লাগে। তাই পরে তারা পুরো ছবিটা না এঁকে কয়েকটি রেখার টানে বুঝিয়ে দিত তারা কি বলতে চায়। তাদের সেই লেখার চেহারা দেখতে অনেকটা তীরের ফলার মত। তাই সেগুলিকে বলা হয় বাণমুখো লিপি। মেসো-পটেমিয়ার ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত মন্দিরের পাথরে আর অসংখ্য

পোড়ামাটির পাত্রে পাওয়া গিয়েছে এই লেখার নমুনা। মনের কথা লিখে প্রকাশ করার এই পদ্ধতি যত জটিলই মনে হোক না কেন টাইগ্রিস ও ইউ-ফ্রেটিস উপত্যকায় এই ভাষা তিনশ' বছরেরও বেশিদিন টিঁকে ছিল।

অনুশীলনী

১। স্থায়িভাবে বসতি স্থাপনের জন্যে প্রাচীন যুগের মানুষ কি ধরনের জায়গা পছন্দ করত এবং কেন?

২। কারা প্রথম মেসোপটেমিয়ায় আসে? তখন মেসোপটেমিয়া জায়গাটা কেমন ছিল? কিভাবে তারা জায়গাটাকে নিজেদের বসবাসের উপযোগী করে নিয়েছিল?

৩। মেসোপটেমিয়ার মানুষ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল?

৪। মেসোপটেমিয়ায় কি কি শিল্প গড়ে উঠেছিল? কিসের বিনিময়ে জিনিস কেনাবেচা হোত?

৫। মেসোপটেমিয়া থেকে যেসব প্রাচীন মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে তার বিবরণ দাও।

৬। সুমেররা পাথরের অস্ত্র ছেড়ে তামার অস্ত্র তৈরী করা শুরু করল কেন? তামা তারা কোথা থেকে আমদানি করত?

৭। সুমেররা কি ভাবে লিখত? কোথা থেকে তাদের লেখার পরিচয় পাওয়া যায়? কিসের ওপর তারা লিখত?

৮। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

(ক) মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কি?

(খ) মেসোপটেমিয়ার অবস্থান কোথায় ছিল?

(গ) বিনিময় প্রথা কাকে বলে?

(ঘ) মেসোপটেমিয়ার লিপিকে বাণমুখো বলা হয় কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিশর

অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ঃ মিশর পিরামিডের দেশ, মিশর নীল নদের দান, মিশর মানুষের আদি সভ্যতার জন্মভূমি। কিন্তু কোথায় এই মিশর, যে দেশের নাম মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে? মানচিত্রে দেখতে পাবে আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বকোণে ইজিপ্ট নামে একটা জায়গা আছে। তারই বাংলা নাম মিশর। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর আর পশ্চিমে ধূ ধূ করছে বিরাট সাহারা মরুভূমি। এই মরুভূমির বুকের ওপর দিয়ে চলেছে নীল নদ। এই নীল নদই বাঁচিয়ে রেখেছে মিশরকে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত। নীল নদ না থাকলে সাহারা মরুভূমি কবে গ্রাস করে ফেলত সমগ্র মিশর দেশটাকেই। প্রতি বছর গরমের দিনে নীল নদের প্রবল বন্যায় সমস্ত উপত্যকাটা জলে ডুবে যায়। জল সরে যাবার পর শস্যক্ষেতের ওপর জমে থাকে বেশ কয়েক ইঞ্চি পুরু পলিমাটি। শুধু এই পলিমাটির জন্যেই মরুভূমির দেশ হওয়া সত্ত্বেও মিশরের মাটিতে প্রতি বছর সোনা ফলে।

মানুষের ইতিহাস হ'ল এক ক্ষুধার্ত প্রাণীর খাদ্য সন্ধানের ইতিহাস। যেখানেই খাদ্য মিলেছে প্রচুর সেখানেই মানুষ বসতি স্থাপনের জন্যে ভীড় জমিয়েছে। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস উপত্যকায় যে কারণে মানুষ ভীড় করেছিল সেই একই কারণে নীল নদের উপত্যকাও একদিন ভরে উঠেছিল দেশবিদেশ থেকে ছুটে-আসা মানুষের বসতিতে।

নীল নদের উপত্যকায় যারা বসতি স্থাপন করেছিল তারা কিন্তু সবাই একজায়গা থেকে আসেনি। তারা এসেছিল কেউ আফ্রিকার ভেতর থেকে, কেউ আরবের মরুভূমি থেকে, আবার কেউ বা এশিয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে। সবাই এসেছিল এখানকার উর্বর জমিতে চাষ করে দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে বলে। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা এই সব বিভিন্ন মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাষা সবই ছিল ভিন্ন ধরনের। তাই প্রথম প্রথম তাদের মধ্যে একটু আধটু ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। কিন্তু এক উদ্দেশ্যে একই জায়গায় কিছুদিন একসঙ্গে থাকার ফলে ধীরে ধীরে ঘুচে যেতে থাকল তাদের পরস্পরের ভেদাভেদ। ক্রমে এই সব বিভিন্ন মানুষের সমন্বয়ে সেখানে গড়ে উঠ্ল একটা জাতি যারা নিজেদের

পরিচয় দিত 'রেমি' অর্থাৎ 'মানুষ' এই নামে। তারা তখন সবাই এক জাতি এক প্রাণ হয়ে চাষবাসের উন্নতির কাজে লেগে গেল।

সেচ ব্যবস্থা

চাষ করতে গিয়ে তারা দেখল যে মিশরের সব অঞ্চলই তেমন উর্বর নয়। বহু জায়গায় প্রয়োজনীয় জলের অভাবে চাষ করা যায় না। সুতরাং সেচ ব্যবস্থা করতে না পারলে সব জমি থেকে ফসল পাওয়া যাবে না। সব জমিতে ফসল ফলিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে মিশরের প্রতিটি মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজে লেগে পড়ল। ছোট ছোট খাল কেটে আর কুয়ো খুঁড়ে দেশের সব জমিতেই সুন্দর জলসেচের ব্যবস্থা করে ফেলল তারা। এইভাবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলিমিশে পরস্পর পরস্পরের

সুখসুবিধের দিকে দৃষ্টি রাখার ফলে সহজেই তারা একটি সুসংগঠিত রাজ্যে পরিণত হল।

রাজতন্ত্রের উদ্ভব (ফ্যারাও)

আজও তোমরা প্রায় প্রতিটি গ্রামে দেখতে পাবে একজন করে মানুষ যাঁরা বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতায় অন্য গ্রামবাসীদের চেয়ে বড়। তাই গ্রামের লোকেরা সব ব্যাপারেই তাঁর কাছে আসে পরামর্শ নিতে। তাঁরাই হচ্ছেন গ্রামের নেতা বা মোড়ল। এইভাবে নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার জোরে আপনা থেকেই কোন মিশরীয় হয়ত তাদের সমাজের মোড়ল হয়ে উঠেছিল। কালক্রমে একদিন সেই মোড়ল হয়ে উঠ্‌ল দেশের রাজা। প্রাচীন মিশরে রাজাকে লোকে বলত ফ্যারাও। রাজারা আমাদের চেয়ে অনেক বড় বাড়ীতে বাস করেন। তাই বোধহয় প্রাচীন মিশরীয়রা রাজাকে ফ্যারাও বলত। কারণ মিশরীয় ভাষায় ফ্যারাও কথাটির অর্থ হ'ল যে ব্যক্তি বড় বাড়িতে বাস করে। এই ফ্যারাওরা দেশ শাসন করতেন আর নিজের দেশ আক্রান্ত হলে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। এই ফ্যারাওরাই যুদ্ধ করে ভূমধ্যসাগর থেকে পশ্চিমাংশের পর্বতমালা পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই সব রাজনৈতিক ব্যাপারে মিশরের খেটে খাওয়া মানুষ বিশেষ মাথা ঘামাত না। প্রজাদের চোখে রাজা ছিলেন নররূপী দেবতা। ফ্যারাওদের অধীনে থাকতেন মন্ত্রী এবং সামন্ত নেতারা। তাঁরা রাজার নির্দেশমত রাজকার্য চালাতেন। আইনতঃ দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন ফ্যারাওরা এবং জমির উদ্বৃত্ত ফসল সবই রাজার শস্যাগারে জমা হোত।

পুরোহিত সম্প্রদায়

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ষোল ঘন্টাই কেটে যেত খাদ্যের সন্ধানে। তাই অন্য চিন্তা করবার মত কোন অবকাশই ছিল না তখন মানুষের। কিন্তু চাষবাস শেখার পর খাদ্য সংগ্রহের জন্যে মানুষকে আর অত সময় ব্যয় করতে হয় না। চাষের সব কাজ করেও তার হাতে এখন থাকে প্রচুর সময়। এই অবসর সময়ে চিন্তা করতে করতে তার মাথায় জাগল নানান্‌ প্রশ্ন। আকাশের তারাগুলো কি? কোথা থেকে আসে তারা? আকাশে মেঘের ডাক, বাজপড়ার শব্দ—এসব আওয়াজ করে কে? মানুষ কে? মৃত্যুর পর সে কোথায় যায়? এই ধরনের বহু প্রশ্ন তাকে ভাবিয়ে তুলল। কিন্তু এ সব প্রশ্নের উত্তর

সে আর খুঁজে পায় না হাজার চিন্তা করেও। শেষে এক শ্রেণীর মানুষ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন যথাসাধ্য এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে। মিশরীয় সমাজে এঁরাই পুরোহিত নামে পরিচিত হলেন। এঁরা ছিলেন মহাজ্ঞানী। তাই সমাজে তাঁরা প্রচুর সম্মান পেতেন। প্রথম দিকে ফ্যারাওরা নিজেরাই প্রজাদের মঙ্গল কামনা করে মন্দিরে দেবতাদের কাছে পূজো দিতেন। পরে তাঁরা মন্দিরে পূজোর দায়িত্ব ছেড়ে দেন এই পুরোহিতদের হাতে। সে যুগে লেখাপড়ার চর্চা যা কিছু তা সব কেবল এঁরাই করতেন। মন্দিরের একাংশে বসে তাঁরা লেখাপড়ার চর্চা চালিয়ে যেতেন। এ বিষয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠ দান হ'ল চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় হাইরো-গ্লিফিক্স্। এর অর্থ হ'ল পুরোহিতের সচিত্র লেখা।

মিশরীয় লিপি

মিশর যখন একটা সুসংগঠিত রাজ্যে পরিণত হয়ে গেছে তখন সরকারী কাজ চালানো, তার হিসেব-পত্তর রাখা এ সব তো আর মুখে মুখে হয় না। তাই পুরোহিতদের চিত্রলিপির আগেই সেখানকার মানুষ এক-ধরনের সাংকেতিক ভাষা আবিষ্কার করেছিল। একদিক দিয়ে এই
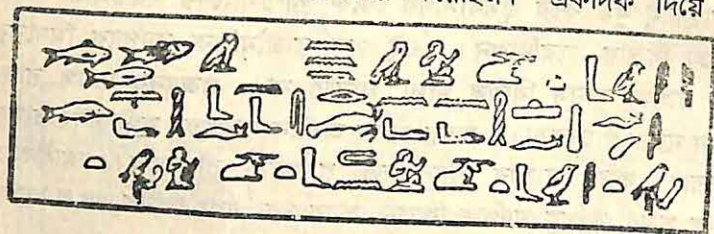
মিশরীয় লিপি

মিশরীয় লিপি সুমেরীয়দের বাণমুখো লিপির চেয়ে কিছুটা উন্নত ধরনের। আমরা কোন বড় শব্দ পড়ার সময় তাকে কয়েকটি অংশে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ি। বাণমুখো লিপিতে একটি মাত্র অক্ষর দিয়ে শব্দের ঐরকম একটি অংশ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু মিশরীয় লিপিতে আছে প্রতিটি অক্ষরের জন্যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ। তবে তাদের লেখায় স্বরবর্ণের ব্যবহার একে-বারেই নেই।

লিপিকার

সেযুগে একমাত্র সরকারী কেরানী ছাড়া লেখার কাজের প্রয়োজন ছিল না আর কারুরই। আর লেখা জিনিসটা সে যুগে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। বিশেষ জ্ঞান আর বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছাড়া লেখার কাজে হাত

দিতে সাহস করত না কেউ। তাই সেযুগে কেরানীগিরি হয়ে দাঁড়াল এক বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বৃত্তি। এই গুণের জন্য তারা সমাজে এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ল আর এই কারণেই কায়িক পরিশ্রম থেকে তাদের সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া হয়েছিল। এই লেখা শেখানোর জন্যে সরকারের নিজস্ব বিদ্যালয় ছিল। সেখান থেকে পাশ করা ছাত্রদের কেরানীর চাকুরীতে নিয়োগ করা হোত। তখনকার ছেলেদের সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল। হয় কেরানীগিরি করার জন্যে সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হও, নয় তো হাতের কাজ শেখার জন্যে কারুর কাছে শিক্ষানবিশি কর, আর তা না হলে চাষবাস কর।

খাজনা আদায়কারী

কেরানী ছাড়া মিশরে আর এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিল। তাদের কাজ ছিল চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা। সামান্য হিসেব-নিকেশের জ্ঞান না থাকলে তারা খাজনাপত্তরের সঠিক হিসেব রাখবে কি করে? তাই যারা একাজে নিযুক্ত হতো গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান তাদের প্রায় সকলেরই কিছু-না-কিছু ছিল। গণিতের সংখ্যা লিখতে এমনকি ভগ্নাংশের হিসেব পর্যন্ত তারা করতে শিখেছিল। জমির কোন নির্দিষ্ট খাজনা বলে কিছু ছিল না। ফসলের উৎপাদন অনুযায়ী প্রতি বছর জমির খাজনা ঠিক করে দেওয়া হোত। প্রতি বছর নীল নদের বন্যা জমিতে যে পরিমাণ পলিমাটি ফেলত তার ওপরেই নির্ভর করত সেই বছর জমির ফলন কতটা হবে। তাই খাজনা আদায়কারীরা প্রতি বছর বন্যার জল সরে যাবার পর মেপে রাখত কোন্ জমিতে কতটা পলি-মাটি পড়ল। তাদের মোটামুটি একটা হিসেব জানা ছিল জমির ওপর কতটা পুরু পলিমাটি জমলে সেবছর সেই জমি থেকে কতটা ফসল ফলতে পারে। সেই হিসেব অনুযায়ী ফসল বোনার আগে শুধু জমির পলিমাটি মেপেই খাজনা আদায়কারীরা চাষীদের জানিয়ে দিত সেবছর তাদের কত খাজনা দিতে হবে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

সেযুগে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ হ'ত সামনা সামনি। তাই নানারকম ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে তখনকার মিশরীয় সৈন্যদের দেহকে মজবুত করে গড়ে তোলা হোত। তারপর বিভিন্ন রকমের অস্ত্র চালনায় তাদের শিক্ষা দেওয়া হোত। কেউ তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত, কেউ বর্শা নিয়ে, আবার কেউ বা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে। স্থানীয় নেতারা ফ্যারাওদের সৈন্য

সরবরাহ করতেন। এই সেনাবাহিনী মিশরের সীমান্ত প্রদেশে মোতায়েন করা থাকত। বাইরের যাযাবর জাতিরা প্রায়ই সীমান্তের গ্রামে ঢুকে চাষীদের ওপর লুঠতরাজ চালাত। এই সেনাবাহিনী তখন যাযাবরদের আক্রমণ থেকে চাষীদের রক্ষা করত।

জায়গীর প্রথা

আগেই বলেছি মিশরের ফ্যারাও ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। মিশর কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা থাকত আর সেই সব অঞ্চল শাসন করতেন ফ্যারাওদের মনোনীত একজন করে শাসক। এছাড়া থাকতেন কয়েকজন মন্ত্রী যাঁরা রাজকার্যে ফ্যারাওদের পরামর্শ দিতেন। এইসব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ফ্যারাওরা একটা করে জমিদারী দিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের নিজের জমিদারীর মধ্যে জমিদাররাই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁদের অধীনে কাজ করত বহু শ্রমিক। খালকাটা, পাথর কাটা, পিরামিড তৈরী করা ইত্যাদি সব কাজই করতে হোত তাদের। এই সব কাজের বিনিময়ে তারা দুবেলা পেটভরে খেতে পেত, পরবার কাপড় পেত আর থাকবার ঘর পেত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রথম প্রথম মিশরের ব্যবসাবাণিজ্য চলত জিনিসের বিনিময়ে। কারণ তখনও মিশরে মুদ্রার প্রচলন হয়নি। পরে অবশ্য সোনা আর রূপোর তৈরী গোলাকার একধরনের চাকতি মুদ্রা হিসেবে চালু হয়। ওজন আর মাপ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকলে জিনিস কেনা-বেচা করা যায় না। মিশরীয়দের কিন্তু এ ধারণা বহু দিন থেকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। স্থল ও জল উভয় পথেই তাদের বাণিজ্য চলত। স্থলপথে উটের পিঠে মাল চাপিয়ে আর জলপথে পালতোলা নৌকোয় করে তারা মালপত্র আনা-নেওয়া করত। ফ্যারাওরা তাঁদের প্রাসাদ, মন্দির আর পিরামিড সাজিয়েছিলেন তামা, সোনা, রূপো আর দামী দামী সব পাথর দিয়ে। কিন্তু এসবের কোনটাই পাওয়া যায় না মিশরে। তাই তাঁরা তামা আনতেন সিনাই থেকে, সোনা নিউবিয়া থেকে, আরব দেশ থেকে আসত মশলা আর এশিয়া থেকে আমদানি করতেন দামী দামী সব পাথর। এইসব ব্যবসা ছিল ফ্যারাওদেরই একচেটিয়া।

ধর্ম বিশ্বাস

মিশরের লোকেরা বিশ্বাস করত কেউ মরে গেলে ভগবানের দরবারে তার পাপ-পুণ্যের বিচার হয়। বিচার শেষে সেই আত্মা আবার পূর্বদেহে

ফিরে আসে। এই ধারণায় মানুষ মারা গেলে তারা তার মৃতদেহকে সযত্নে রক্ষা করত। মৃতদেহকে তেল-মলম মাখিয়ে, মোম মাখানো কাপড় জড়িয়ে এমনভাবে রাখত যে তা সহজে নষ্ট হোত না। এইরকম মৃতদেহকে বলে মমি। সেই মমিকে তারা লুকিয়ে রাখত পাহাড়ের গুহায় বা পিরামিডের ভেতরে।

মমি

পিরামিড

মিশরের আশ্চর্য কীর্তি এই পিরামিড। পিরামিড ত্রিভুজের আকারে মস্ত বড় স্তূপ। গোড়া থেকে ক্রমে সরু হয়ে একেবারে চূড়োয় গিয়ে ঠেকেছে। বড় বড় পিরামিডগুলো ছিল ফ্যারাওদের সমাধি-মন্দির। মৃত্যুর আগেই ফ্যারাওরা নিজেদের সমাধি-মন্দির তৈরী করে যেতেন। এক-একটা পিরামিড তৈরী করতে কোটি কোটি মুদ্রা খরচ হ'ত। বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার মজুর বেগার খাটত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর সাজিয়ে সেগুলি তৈরী হয়েছিল। এইসব বড় বড় পাথরের চাঁই-গুলোকে মজুরেরা বহু-দূর থেকে কেটে বয়ে নিয়ে আসত। পিরা-মিডের ভেতরে যাওয়ার জন্যে ছিল সুড়ঙ্গপথ। ভেতরে কোঠাঘরে ফ্যারাওদের মমি ও তাঁদের যাবতীয় প্রিয়-বস্তু, যেমন—খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাব-পত্র, ধনরত্ন সব সযত্নে রেখে সুড়ঙ্গপথটিকে পরে শক্ত করে গেঁথে দেওয়া হোত যাতে চোর-ডাকাতেরা সেই সব দামী জিনিস চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে।

পিরামিড

তাদের ধারণা ছিল মৃত্যুর পরেও মানুষ ইহজীবনের সব কিছুই সমানে ভোগ করে চলে। তাই মৃতদেহের পাশে রাঁধুনি আর নাপিতের ছোট ছোট মূর্তি গড়ে রেখে দিত তারা যাতে সেই মৃতদেহের রান্না করা খাবারের অভাব না হয় আর তাকে দাড়ি রাখতে না হয়। মিশরের একজন প্রসিদ্ধ ফ্যারাও ছিলেন, তাঁর নাম তুতেন-খামেন। কয়েক বছর আগে সেই তুতেন-খামেনের কবর সম্পূর্ণ অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে মমির পাশে পাওয়া গিয়াছে বহুমূল্য সুন্দর সুন্দর অনেক জিনিস, যেমন—মনোরম রাজছত্র, সোনা-রূপোয় মোড়া রাজসিংহাসন, আরও কত কি!

মিশরের দেবদেবী

প্রাচীন মিশরীয়রা বহু দেবদেবীর পূজো করত। আগেই বলেছি প্রাচীন যুগে মানুষের মনে ধর্মভাব জেগেছিল ভয় থেকে। এই ভয় থেকেই তারা পূজো করতে শুরু করেছিল বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে। প্রাচীন মিশরেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী, নীলনদ—সব কিছুরই একজন করে দেবতা ছিলেন। এই সব দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সূর্য দেবতা 'রে' আর 'আমন' এবং জীবন-মরণের দেবতা 'ওসিরিস'। এছাড়া কুমীর, বেড়াল ও ভেড়ার আকারে কোন কোন দেবতার পূজাও মিশরে প্রচলিত ছিল। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত জীবন-মরণের দেবতা প্রবল প্রতাপশালী ওসিরিস্ বাস করেন পশ্চিমের পর্বতমালার ওপারের দেশে। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা যাবে ওসিরিসের কাছে। তিনি তখন সেই আত্মার কাছে তার কৃতকার্যের জবাবদিহি চাইবেন। তাই মিশরীয়দের প্রতি পুরোহিতদের উপদেশ হ'ল—ইহজীবনে এমন কিছু করবে না যাতে ভগবানের বিচারে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত হতে হয়। মিশরীয়রা ক্রমে বিশ্বাস

আমন

করতে শুরু করল যে, ইহজীবনের দেহ ছাড়া কারুর পক্ষেই ওসিরিসের রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এই জন্যেই তারা মৃতদেহকে পুড়িয়ে

নষ্ট করত না। মমি বানিয়ে তাকে সযত্নে রক্ষা করত পিরামিডের মধ্যে।

বিভিন্ন উপজীবিকা

মিশরের বেশির ভাগ মানুষ তখন জমিতে চাষ-আবাদ করে আর নদীতে মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। তাই চাষী ও জেলেরাই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। আগেই বলেছি ফ্যারাওরা দেশের মধ্যে অনেক মন্দির আর পিরামিড করে গিয়েছিলেন। সেইসব মন্দির আর পিরামিডের মধ্যে থাকত নানান জিনিস। বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ জানা মানুষকে ফ্যারাওরা সেইসব জিনিস তৈরীর কাজে নিযুক্ত করতেন। কেউ সূক্ষ্ম সূতোর কাপড় বুনত, কেউ রঙীন কাঁচ দিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিস বানাত, আবার কেউ বা চামড়ার ওপর নানারকম নক্‌শার কাজ এবং মাটির হাঁড়ি-কলসী তৈরী করে তার ওপর রঙের কাজ করত। এইভাবে বিভিন্ন কুটির শিল্প গড়ে উঠেছিল মিশরে। চাষী এবং জেলে ছাড়া অন্যেরা এইসব শিল্পের যে কোন একটিতে হাত পাকিয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত।

অনুশীলনী

১। মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন?

২। কি উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ দেশ থেকে মানুষ নীল নদের উপত্যকায় বসতি স্থাপন করতে এসেছিল?

৩। জমিতে জলসেচের জন্যে মিশরের লোকেরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল?

৪। মিশরে কি ভাবে রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৫। মিশরে কিভাবে পুরোহিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়?

৬। পুরোহিতদের কাজ কি ছিল?

৭। খাজনা আদায়কারী কিভাবে জমির খাজনা নিরূপণ করতেন?

৮। ফ্যারাওরা কিভাবে দেশ শাসন করতেন?

৯। পিরামিড কি? তার মধ্যে কি রাখা হোত?

১০। পরলোক সম্বন্ধে মিশরীয়দের কি ধারণা ছিল?

১১। মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস কি ছিল?

১২। মিশরীয় চিত্রলিপি ও সুমেরদের বাণমুখো লিপির মধ্যে তফাত কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধু

ভূমিকা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নব প্রস্তর যুগের ছোট ছোট গ্রামগুলি ক্রমেই বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল। গ্রামের জনসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। চাষের ফসল গ্রামের সবাই পেট ভরে খেয়েও প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকতো। খাদ্যের অভাব ঘোচার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে জাগতে শুরু করল নতুন নতুন অভাববোধ। এই অভাব মেটাবার জন্যে গ্রামের মধ্যে গড়ে উঠল নানা ধরনের শিল্প, যেমন—ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প, বয়ন শিল্প ইত্যাদি।
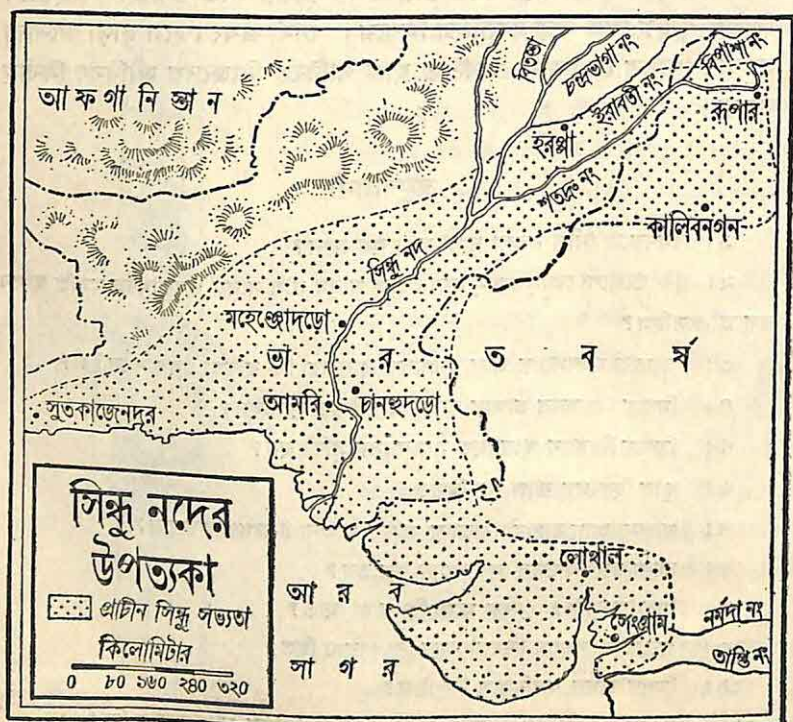
ইতিমধ্যে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখে ফেলেছে। প্রস্তর যুগকে পেছনে ফেলে মানুষ তখন ধাতু যুগে পৌঁছে গেছে। এখন আর গ্রামের সকলকে চাষ-বাস করতে হয় না। এখন পণ্য বিনিময় করে গ্রামবাসীরা নিজের

নিজের অভাব মেটাচ্ছে। যেমন চাষী তার কাপড়ের অভাব মেটাচ্ছে নিজের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য তাঁতীর কাছে বিক্রী করে। এইভাবে বিভিন্ন শিল্পকার্যের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরা তখন নিজেদের স্বার্থে একটা নির্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলতে লাগল। এইভাবেই প্রাচীন যুগের বিভিন্ন শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলি ধীরে ধীরে নগরের রূপ গ্রহণ করতে শুরু করে।

আবিষ্কার

ভারতবর্ষে এইরকম নগরের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত লারকানা জেলার মহেঞ্জোদারো এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্গত মন্টগোমারী জেলার হরপ্পা নামক জায়গায়। এই মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মূলে আছে বিখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনীষা ও উদ্যম। এই আবিষ্কার ভারতের সুদূর অতীতের এক অন্ধকার যুগে আলোকপাত করেছে সন্দেহ নেই।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৪০০ মাইল। তা হলেও এ দু'জায়গায় যে সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে সেগুলি দেখতে প্রায় একই রকম। তাছাড়া গত ৩০ বছর ধরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মাটি খুঁড়ে আরও অনেক শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে যার সঙ্গে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা শহরের যথেষ্ট মিল আছে। এরকম একটি শহর আবিষ্কৃত হয়েছে চণ্ডীগড়ের কাছে রূপারে। দ্বিতীয়টি আমেদাবাদের কাছে লোথালে। তৃতীয়টি রাজস্থানের কাছে কালিবনগনে এবং চতুর্থটি সিন্ধু দেশের কোটদিজিতে। সিন্ধু নদের বিস্তৃত অববাহিকা অঞ্চল জুড়ে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে এ সভ্যতা ইতিহাসে সিন্ধু-সভ্যতা নামে পরিচিত। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এ সভ্যতাকে হরপ্পা সংস্কৃতি নামেও উল্লেখ করে থাকেন।

নগর পরিকল্পনা

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার লোকেরা ছিল সুসভ্য। আজকালকার শহরে লোকের মত তারাও শহরে বাস করত। শহরে থাকে বড় বড় রাস্তা, সেখানেও ছিল সেরকম সোজা ও সমান মাপের চওড়া রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে ছিল জল নিকাশের জন্যে পাকা ড্রেন বা নালা। কোন কোন নালা আবার পাথর দিয়ে ঢেকে রাখারও ব্যবস্থা ছিল। শহরের বাড়ীগুলো প্রায় সবই পোড়া ইটের তৈরী। দুই কামরার বাড়ীও যেমন

আছে, তেমনি আবার প্রাসাদের মত বড় বড় বাড়ীও দেখা যায়। বড় বাড়ীগুলোর অধিকাংশই ছিল দু'তলা বা তিনতলা আর প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ছিল কুয়ো, নর্দমা, পয়ঃপ্রণালী ও স্নানাগার।

সাধারণ বাসগৃহ ছাড়া মহেঞ্জোদারোতে কতকগুলি বহু স্তম্ভযুক্ত হলঘর আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি সম্ভবতঃ প্রাসাদ, প্রার্থনাগৃহ অথবা
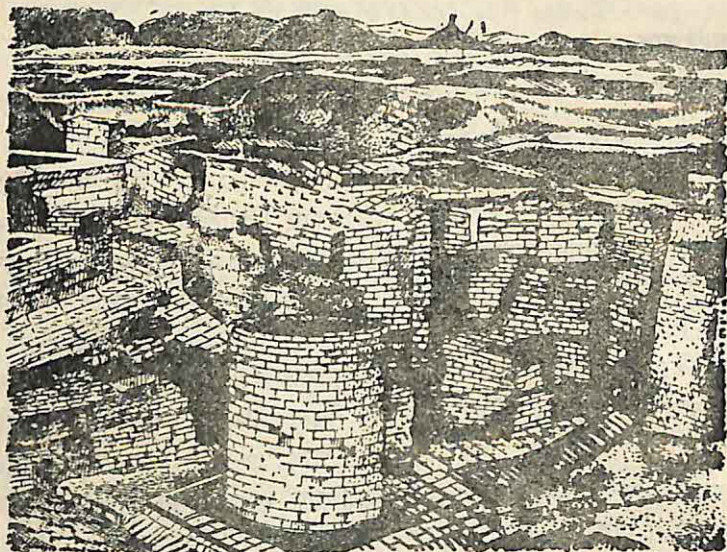
হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ

পৌরসভাগৃহ ছিল বলেই মনে হয়। নগরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ছিল ১৮০ ফুট লম্বা আর ১০৮ ফুট চওড়া বিরাট এক স্নানাগার। তার মধ্যে ছিল সাঁতার কাটার জন্যে ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট গভীর এক পুকুর। পুকুরে নামবার জন্যে ছিল বাঁধানো ঘাট আর পাড়ে বসে আরাম করবার জন্যে ছিল সারি সারি আসন।

হরপ্পায় যে শহরটি মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় শহরটি ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেই পাঁচিল ঘেরা শহরের মধ্যে পাওয়া গেছে বিরাট এক শস্যাগার। মনে হয় চাষীরা খাজনার বিনিময়ে শস্য দিত সরকারকে। সেই শস্য মজুত করে রাখার জন্যেই বোধ হয় এই বিরাট শস্যাগার নির্মিত হয়েছিল। মোটের ওপর ঐসব ধ্বংসাবশেষ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সুদূর অতীতে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা উন্নত পৌর জীবনের সব রকম সুখ-সুবিধাই ভোগ করতেন।

খাদ্য এবং অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য

কৃষি, পশুপালন, শিল্প, বাণিজ্য সব বিষয়েই সিন্ধু উপত্যকার মানুষ ছিল সমান পটু। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু, ভেড়া, হাতী ও উট। চাষ হোত গম, যব ও তুলোর। তাই তাদের প্রধান খাদ্য ছিল গম ও যব। এছাড়া মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও খেজুরও তারা খেত।

সেকালে তামা, ব্রোঞ্জ, সীসা, টিন ইত্যাদির ধাতু থেকে তৈরী রকমারী অস্ত্র, যন্ত্র, বাসন ও আসবাব পাওয়া গিয়েছে সিন্ধু উপত্যকার ধ্বংসাবশেষ থেকে; যেমন—কুঠার, বর্শা, ছোরা, ছেনি, ছুরি, বঁড়শি, ক্ষুর ও পাত্র। সোনা, রূপা আর দামী পাথরের গয়নায় অঙ্গসজ্জা হোত, যেমন—হার,
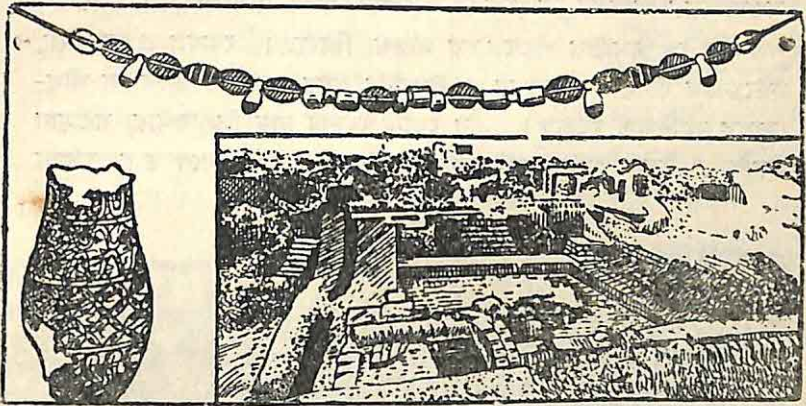
মহেঞ্জোদারোর পাকা পুকুর, উপরে গহনা ও বাঁপাশে মাটির হাড়ি

বালা, তাগা, আংটি, নথ, নূপুর, দুল। পুরুষেরাও অলঙ্কার পরত। মিহি সূতোর সৌখীন কাপড়, হাতীর দাঁত, পাথর আর শাঁখের তৈরী সখের জিনিস ছিল বিলাসিতার অঙ্গ। শীত নিবারণের জন্য তারা পশমের বস্ত্র ব্যবহার করত। কুমোর চাকা ঘুরিয়ে মাটির পাত্র গড়ত তারপর তাকে পুড়িয়ে শক্ত করত। পাত্রের ওপর নানারকম নক্শা এঁকে চকচকে পালিশ দিত। কেউ কেউ আবার তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ও চিনামাটির বাসনও ব্যবহার করত। লোহার প্রচলন একেবারেই ছিল না। এখানে কোন লোহার জিনিস পাওয়া যায়নি।

শিল্প

চাষ-আবাদই ছিল সাধারণ মানুষের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকার্য ছাড়া অন্যান্য শিল্পেও বেশ হাত পাকিয়েছিল সে যুগের মানুষ। মৃৎ-শিল্পীরা

গড়ত নানাধরনের সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র। তুলো থেকে কাপড় বুনত তাঁতীরা। কাঠের কাজের জন্যে ছিল ছুতোর আর বাড়ীঘর তৈরী করত রাজমিস্ত্রী। এছাড়া সূক্ষ্মকাজের গয়না গড়ার জন্যে ছিল কত-রকমের শিল্পী। কেউ শুধু সোনা-রূপোর কাজ করত, কেউ করত হাতীর দাঁতের কাজ, আবার কেউ বা শুধু দামী দামী পাথর কাটত জড়োয়ার গয়না তৈরীর জন্যে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

মাটির ফসল আর কারিগরের তৈরী মাল দেশদেশান্তরে চালান যেত। সওদাগরেরা মালপত্র মোড়কে বেঁধে শীলমোহরের ছাপ লাগাত। এরকম শত শত পোড়ামাটির শীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। কেবল এখানে নয়, ইউফ্রেটিস উপত্যকার সুমের ও ইলামের শহরগুলোতেও এইরকম শীল-মোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় সিন্ধুবাসীরা বর্তমান ইরাক ও ইরান পর্যন্ত বাণিজ্যবিস্তার করেছিল। বিদেশে তারা চালান
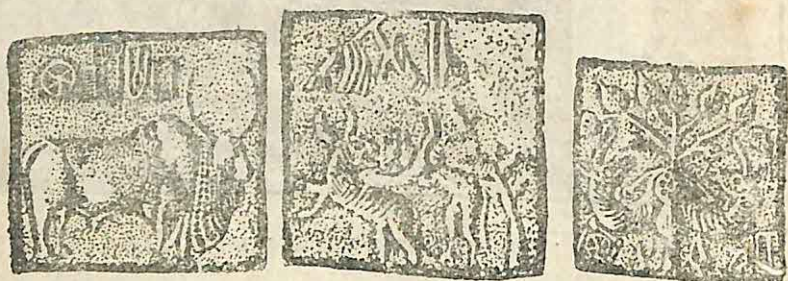
মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত শীলমোহর

দিত প্রধানতঃ তুলো। জল ও স্থল উভয়পথেই চলত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। পশ্চিমদিকে বেলুচিস্তানে মাল যেত গরুর গাড়ী করে। পশ্চিম থেকে আসত তামা, টিন ও দামী পাথর, দক্ষিণে দ্রাবিড়দের দেশ থেকে আমদানি হোত সোনা। দেশের বাজারে বেচা-কেনার জন্যে ওজনের বাটখারা ও মাপের কাঠি (গজকাঠির মত) ছিল। মুদ্রার কাজ চলত তামা অথবা ব্রোঞ্জের চারকোণা পাত দিয়ে।

ধর্ম

সিন্ধু উপত্যকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোন দেবমন্দির আবিষ্কৃত হয়নি। তাই তখনকার মানুষের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা

যায় না। তবে সেখানে অনেকগুলি নারীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবতঃ এই মূর্তিগুলিকে তারা দেবীরূপে কল্পনা করে পূজো করত। তাই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে তারা ছিল জগন্মাতার উপাসক। এই সব নারীমূর্তি ছাড়াও শীলমোহরের ওপর অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র পাওয়া গিয়েছে। সেই চিত্রে দেখা যায় জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে ধ্যানাসনে বসে আছে এক যোগীমূর্তি। তোমরা জান মহেশ্বর শিব ছিলেন মহাযোগী এবং তাঁর অপর নাম পশুপতিনাথ। তাই এই চিত্র দেখে পণ্ডিতদের অনুমান সিন্ধু উপত্যকার মানুষেরা জগন্মাতার সঙ্গে পশুপতিনাথ শিবেরও উপাসনা করত। এছাড়া পাথর, গাছ এবং কিছু কিছু জীবজন্তুকেও তারা পবিত্র মনে করত।

পশুপতিনাথ শিব

সমাজে মানুষের শ্রেণীবিভাগ

সিন্ধু উপত্যকার শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গিয়েছে বড় হলঘর, স্নানাগার, শস্যাগার ইত্যাদি। মনে হয় এসব কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। এ ছাড়া ছিল চওড়া রাস্তার ধারে বড় বড় বাড়ী। বাড়ীর মধ্যে একাধিক ঘর। কোনটা শোবার ঘর, কোনটা বসার ঘর, কোনটা রান্নাঘর, আবার কোনটা বা স্নানের ঘর। এগুলি ছিল সমাজে পয়সাওয়ালা লোকেদের বাড়ী। এই সব বড় বাড়ীর পাশাপাশি ছিল অনেক ছোট ছোট বাড়ী। এই সব বাড়ীর মালিকরা ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্ত। আর ছিল অসংখ্য ছোট দোকানঘর। বড় রাস্তার পেছনে সরু গলির মধ্যে ছিল সার সার দুকামরার খুপরি। সেখানে বাস করত সমাজে সর্বহারার দল যাদের না ছিল অর্থ, না ছিল কোন মর্যাদা। অপরের বেগার খেটেই তাদের কাটাতে হোত সারা জীবন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকার সমাজে বাস করত বিভিন্ন ধরনের মানুষ। সবার ওপরে ছিল শাসকগোষ্ঠী, তার পরেই ছিল বড় বড় জমিদার ও ব্যবসাদার-গোষ্ঠী। এরপর যাদের স্থান তারা হোল ছোট দোকানদার এবং বিভিন্ন হস্তশিল্পের কারিগরগোষ্ঠী এবং সবার নীচে ছিল সর্বহারা ক্রীতদাস সম্প্রদায়। ধ্বংসাবশেষ থেকে সমাজে মানুষের এই শ্রেণীবিভাগ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়।

সিন্ধুসভ্যতার বিলুপ্তির কারণ

কি করে যে সিন্ধুসভ্যতার অবসান ঘটেছিল তা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারেন না। মনে হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই এর কারণ। সম্ভবতঃ এক সময় জলবৃষ্টি বন্ধ হয়ে নদীর ধারা দূরে সরে গিয়েছিল। তারপর সূর্যকিরণে উর্বর উপত্যকা শুকিয়ে যেতে লাগল। সিন্ধুবাসীদের পৌর সভ্যতাও শুকিয়ে মরে গেল। বালির স্তূপে তার সমাধি হোল।

সিন্ধুসভ্যতার গুরুত্ব

সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিল আর্যদের ভারতে আসার পর থেকেই ভারতীয় সভ্যতার শুরু। আর্যরা এদেশে আসার আগে ভারতবাসীরা ছিল অসভ্য ও বর্বর। আর্যদের সংস্পর্শে এসেই তারা প্রথম সুসভ্য হয়ে ওঠে—এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কার তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারতীয় সভ্যতা মিশরীয় বা ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সমকালীন।

অনুশীলনী

১। সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের পেছনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি? সিন্ধু-সভ্যতা নামকরণ হ'ল কেন? মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা শহরের সঙ্গে মিল আছে এমন শহর ভারতবর্ষের আর কোথায় কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে?

২। সেখানকার নগর পরিকল্পনা কি রকম ছিল?

৩। সিন্ধু উপত্যকায় কি কি শিল্প গড়ে উঠেছিল?

৪। কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার লোকদের বাণিজ্য সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল? কি কি জিনিস আমদানি ও রপ্তানি করা হোত?

৫। সমাজে কত রকমের মানুষ বাস করত?

৬। ধর্ম সম্বন্ধে তাদের ধারণা কি ছিল?

৭। অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ—

(ক) হরপ্পার মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে বিরাট এক স্নানাগার।

(খ) মহেঞ্জোদারো ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্গত মন্টগোমারী জেলায় অবস্থিত।

(গ) সিন্ধুবাসীরা লোহার তৈরী অস্ত্র ব্যবহার করত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চীন

হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং উপত্যকাঃ চীনের সভ্যতাও খুব প্রাচীন। এই দেশের দুটি প্রসিদ্ধ নদী---একটির নাম হোয়াং-হো, অপরটির নাম ইয়াং-সি-কিয়াং। চীনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এই দুই নদীর উপত্যকায়। হোয়াং-হো বড় সর্বনাশা নদী। তোমরা আমাদের দেশে দামোদর ও তিস্তার ভয়াবহ বন্যার কথা নিশ্চয় শুনে থাকবে। সেইরকম ভীষণ ও ভয়াবহ ছিল হোয়াং-হো নদীর বন্যা। প্রতি বছর কত বাড়ীঘর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কত মানুষের যে প্রাণহানি ঘটিয়েছে এই নদীর বন্যা তার আর ইয়ত্তা নেই। এই জন্যেই ভূগোলে এই নদীর আর এক নাম---'চীনের দুঃখ'। এই জন্যেই সেই প্রাচীনকালে চীনজাতি হোয়াং-হো নদীর তীরে উঁচু বাঁধ দিয়ে জমি রক্ষা করত আর আশে-পাশে উঁচু জমিতে ঘর বেঁধে বাস করত।

প্রাচীন চীনের ইতিকথা

আমাদের দেশের মত চীন দেশেও বহু পৌরাণিক প্রবাদ গল্প প্রচলিত আছে। তেমনি একটি গল্পে জানা যায় পান্‌কু নামে এক দেবতা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি নাকি হাতুড়ি, বাটালি দিয়ে আকাশে ভাসমান পাথরের পাহাড় কেটে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সৃষ্টি করেন।
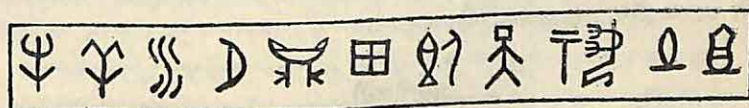
প্রাচীন চীনা হরফ

এইভাবে আঠার হাজার বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পান্‌কু জীবন বিসর্জন দেন। তখন পৃথিবীর সৃষ্টি হোল। তাঁর মাথা থেকে হোল পাহাড়-পর্বত, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে বাতাস আর শিরা থেকে বইল নদীর স্রোত। তাঁর দেহে যে কীট জন্মেছিল তা থেকে সৃষ্টি হ'ল মানুষ।

প্রবাদ গল্পে আরও কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। প্রথম রাজা ছিলেন ফুসি। তিনি সঙ্গীতবিদ্যা, লেখার কৌশল, জাল দিয়ে মাছ ধরা এবং কি করে গুটি পোকা পালন ও গুটি পোকা থেকে রেশম বের করতে হয় সেই কৌশল শিখিয়েছিলেন। তাঁর পর রাজা হলেন শেন্‌-নুঙ।

তিনিই প্রথম কাঠের লাঙ্গল আবিষ্কার করে চাষ-আবাদ করতে শেখান চীনা জাতিকে। শুধু কৃষিকাজই নয় তাঁকে চিকিৎসাবিদ্যারও জনক বলা হয়। তৃতীয় রাজা **হোয়াং-তি**। প্রথম ইটের বাড়ী তৈরী ও মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁরই কীর্তি। চতুর্থ রাজার নাম **ইয়াও**। তাঁরই সময়ে একবার হোয়াং-হো নদীর প্রবল বন্যায় সারা দেশ ভেসে গিয়েছিল। বন্যার কবল থেকে দেশ রক্ষার জন্যে তিনি শান্ নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। এই শান্ই ছিলেন পঞ্চম রাজা। **শান্**-এর পর রাজা হল ইউ। তিনি ছিলেন একজন মস্তবড় পূর্তবিশারদ (ইঞ্জিনিয়ার)। কথিত আছে, বন্যার প্রকোপ দূর করার জন্যে তিনি নাকি নয়টি পাহাড় কেটে নয়টি কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করেছিলেন। বন্যার জল গিয়ে তখন জমা হতে লাগল সেই সব হ্রদে। তারপর খাল কেটে সেই হ্রদের জলকে তিনি বইয়ে দিলেন চাষের জমিতে। এইভাবে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করে তিনি দেশে চাষ-বাসের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন।

ধর্মবিশ্বাস

প্রাচীন চীনা জাতি নানা দেব-দেবীর পুজো করত। একটি বিশেষ পুজোর প্রচলন ঘরে ঘরেই ছিল---তা হোল পিতৃপুরুষের পুজো। চীনাদের গভীর বিশ্বাস ছিল যে, বংশধরদের পুজো পেলে পিতৃপুরুষের আত্মা তৃপ্তি পায়। তাছাড়া মেঘ, বৃষ্টি, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী প্রভৃতি প্রকৃতির পুজোও তারা করত। সমস্ত দেবতার ওপরে ছিলেন আকাশের দেবতা। এই দেবতার নাম **থিয়েন**। চীনের ড্রাগনের কথা তোমরা হয়ত' শুনেছ। ইনি হলেন চীনাদের জল-বৃষ্টির দেবতা।

অনুশীলনী

১। কোন্ নদীকে 'চীনের দুঃখ' বলে? কেন তার ঐ নাম?

২। পান্কু কে? তিনি কিভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন?

৩। কে কি ভাবে চীনদেশে চাষ-বাসের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন?

৪। ফুসি এবং শেন্-নুঙ কে ছিলেন? তাঁরা প্রাচীন চীনজাতিকে কোন্ কোন্ বিদ্যা শিখিয়েছিলেন?

৫। সঠিক উত্তর বন্ধনীর মধ্যে থেকে বেছে বার কর ঃ

(ক) কে গুটিপোকা থেকে রেশম বের করার কৌশল শিখিয়েছিলেন?
(পান্কু, ফুসি, শান্)

(খ) কোন্ বিশেষ পুজোর প্রচলন চীনের ঘরে ঘরেই ছিল?
(ড্রাগন, সূর্য, পিতৃপুরুষ)

(গ) চীনের পৌরাণিক কাহিনীতে পূর্তবিশারদ হিসেবে কার নাম পাওয়া যায়? (ইউ, হোয়াং-তি, শান্)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নদী উপত্যকার সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন যুগে মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু প্রদেশ অঞ্চলে যে সব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা সবই ছিল কোন-না-কোন নদীর তীরে। চাষ-আবাদ শেখার পর মানুষ স্থায়িভাবে একজায়গায় বসবাসের উদ্দেশ্যে নদীতীরবর্তী অঞ্চলকেই বেছে নিয়েছিল। তার কারণ চাষ-বাসের পক্ষে নদীতীরই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।

নদীতীরে বাস করলে বন্যাকে মেনে নিতেই হবে। বন্যা যেমন মানুষের ক্ষতি করে, তেমনি আবার বন্যার জলকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে তা দিয়ে মানুষের উপকারও হয় যথেষ্ট। তাই প্রাচীন যুগে নদী উপত্যকার সব সভ্য দেশেই দেখি বন্যার প্রকোপ আর দেখি সবাই বন্যার জলকে কাজে লাগিয়ে দিব্যি চাষ-বাসের উন্নতি করে ফেলেছে। তাই সহজেই খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল ঐ সব দেশে। আর খাদ্যাভাব ছিল না বলেই দ্রুত জনবহুল হয়ে উঠেছিল প্রতিটি দেশ।

প্রথম যুগে মানুষের খাদ্য সমস্যাই ছিল প্রধান। শুধু খাবার জোগাড় করতেই কেটে যেত তাদের সারাটা দিন। পেটের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করার কোন অবকাশই ছিল না তাদের তখন। খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবার পর থেকেই মানুষের মনে জাগতে শুরু করল নতুন নতুন অভাববোধ। এতদিন সে শুধু খাই খাই করে এসেছে। খাবারের সংস্থান হয়ে যাবার পর থেকে শুরু হয়েছে তার চাই চাই।

মাথাগোঁজার ঘর চাই, পরণের কাপড় চাই, নিত্য ব্যবহারের আসবাব ও বাসনপত্তর চাই, এমন কি অঙ্গসজ্জার অলঙ্কার পর্যন্ত চাই। তাই দেখা যায় চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে সব নদী উপত্যকা অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে মৃৎ-শিল্প, দারুশিল্প, বয়ন শিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের শিল্প। এইভাবে এক একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল সমাজের মধ্যে।

দেশে যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় তা দেশের লোকের প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত মাল বিদেশের বাজারে বিক্রি করতে না পারলে লোকসান। তাই দেখা যায় সব নদী উপত্যকা অঞ্চলের অধিবাসীরাই বৈদেশিক বাণিজ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নদীতীরে বাস করার ফলে নৌবিদ্যায় স্বভাবতঃই তারা বেশ পটু হয়ে উঠেছিল। তাই জলপথে বৈদেশিক বাণিজ্য চালাতে তাদের কোন অসুবিধে হয়নি।

নিজেদের দেশের মাল বিদেশে বিক্রি করে বিনিময়ে বিদেশ থেকে তারা নিয়ে আসত এমন সব দ্রব্যসামগ্রী যা তাদের নিজেদের দেশে উৎপন্ন হয় না। এই বৈদেশিক বাণিজ্য সব নদী উপত্যকা অঞ্চলকেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুব সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সমাজে একশ্রেণীর মানুষের হাতে জমে গেল প্রচুর অর্থ। ক্রমে এই ধনীসম্প্রদায়ই হয়ে উঠল সমাজের মাথা। সমাজের যাবতীয় সুখসুবিধা তাদেরই তখন একচেটিয়া হয়ে দাঁড়াল। এইভাবে সমাজে এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী গড়ে উঠল।

নদী উপত্যকা অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে যে সব ঘরবাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে তা সবই প্রায় পোড়া ইটের তৈরী। তার কারণ নদী উপত্যকা পলিমাটি দিয়ে গড়া আর পলিমাটি দিয়েই তৈরী হয় ইট। তাই ঘর-বাড়ি তৈরীর কাজে নদী উপত্যকা অঞ্চলের লোকেরা পোড়া ইটকেই পাথরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করত।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেটা প্রায় প্রাচীন সব নদী উপত্যকা অঞ্চলেই লক্ষ্য করা যায় তা হোল বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করা। তার কারণ তারা ছিল প্রধানতঃ কৃষিজীবী। চাষ-আবাদ করতে গিয়ে তারা বুঝেছিল যে, পর্যাপ্ত পরিমাণ জল, বৃষ্টি, রোদ না পেলে জমিতে ফসল ফলানো যায় না। রোদ, বৃষ্টি, জল—এ সবই প্রকৃতির দান। তাই এদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে তারা সূর্য, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে পুজো করত যাতে প্রয়োজনের সময় রোদ-বৃষ্টির অভাব না ঘটে কোনদিন।

অনুশীলনী

১। প্রাচীন নদী-উপত্যকার দেশগুলিতে শিল্প গড়ে ওঠার কারণ কি? বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠার ফলে সমাজের কি পরিবর্তন হয়েছিল?

২। নদী-উপত্যকা অঞ্চলের দেশগুলিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের কারণ কী?

৩। তারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করত কেন?

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

লোহ যুগের সমাজ

লৌহের আবিষ্কার ও ব্যবহারঃ লোহা যে কবে এবং কোথায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল তা আজও কেউ সঠিকভাবে বলতে পারেন না। তবে একথা ঠিক একই সঙ্গে পৃথিবীর সব দেশে লোহার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েনি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে লোহার প্রচলন শুরু হয়েছিল। লোহার তৈরী যন্ত্রের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে মিশরের রাজা খুফুর পিরামিডের মধ্যে। খুফুর রাজত্বকাল আজ থেকে প্রায় পাঁচ-হাজার বছর আগেকার কথা। ঐতিহাসিকদের ধারণা পিরামিডের যুগ থেকেই মিশরের লোকেরা লোহা ব্যবহার করে আসছে। কারণ পিরামিড তৈরীর জন্য বিরাট পাথরের চাঁইগুলোকে মাপসই করে কাটা লোহার তৈরী কোন যন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়। এই পিরামিডের যুগ হলো আমাদের দেশের সিন্ধু-সভ্যতার সমসাময়িক। অথচ সিন্ধু উপত্যকায় তখনও লোহার ব্যবহার শুরু হয়নি। তাই বলছিলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে লৌহ যুগের সূচনা হয়েছিল। তবে ইতিহাসে লৌহ যুগ বলতে বোঝায় সেই সময়কে যখন থেকে লোহার ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেছে পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশেই আর সেটা হয়েছে আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর লৌহ যুগের প্রভাব

এই লৌহ যুগ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। প্রাচীন যুগের মানুষেরা প্রায় সবাই ছিল চাষ-বাসের ওপর নির্ভরশীল। সে যুগে জমির কোন দাম ছিল না এবং তা কেনা-বেচাও হোত না। বনজঙ্গল কেটে যে যতখানি চাষের জমি তৈরী করে নিতে পারত তাই হয়ে যেত তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। লৌহ যুগের আগে তামা আর ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি দিয়ে বনজঙ্গল কাটা ছিল রীতিমত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কারণ তামা আর ব্রোঞ্জ দুই-ই ছিল খুব মূল্যবান ধাতু। তাই দেখা যায় শুধু অবস্থাপন্ন লোকেরাই চাষের জমির মালিক হয়ে উঠেছেন। দেশের সাধারণ মানুষের নিজস্ব জমি বলতে কিছুই ছিল না। চাষ করতে গেলে লাঙল, কোদাল, নিড়ানি প্রভৃতি যে সব যন্ত্রপাতি লাগে, লৌহ যুগে তা সবই তৈরী হতে লাগল লোহা দিয়ে। লোহা তামা বা

ব্রোঞ্জের তুলনায় অনেক মজবুত আর সস্তা। ফলে চাষ-বাসের দ্রুত উন্নতি হোল লৌহ যুগে এসে।

লোহা দামে সস্তা বলে সাধারণ মানুষও লোহার তৈরী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে গেল। তার ফলে সেই সব যন্ত্রপাতি দিয়ে সাধারণ মানুষও বনজঙ্গল কেটে নিজেদের জন্যে চাষের জমি নিজেরাই তৈরী করে নিতে লাগল। তাই বলা যায় লোহার ব্যবহারই প্রাচীনযুগের সাধারণ মানুষকে জমির মালিক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

লৌহ যুগের আগে শুধু ধনী লোকেরাই নিজেদের ব্যবহারের জন্যে অস্ত্র রাখতে পারত। কারণ আগেই বলেছি তামা আর ব্রোঞ্জ মূল্যবান বলে ঐ সব ধাতুর তৈরী কোন জিনিস ব্যবহার করা সাধারণ মানুষের সামর্থ্যে কুলোত না। তাই সে যুগে ধনীরা শুধু অস্ত্রবলেই সমাজের অন্য শ্রেণীর লোকেদের দাবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু লোহা আবিষ্কারের পর অস্ত্রের দাম যখন কমে গেল তখন সাধারণ মানুষও অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে তাদের সমকক্ষ হয়ে উঠ্‌ল।

তাছাড়া যুদ্ধের প্রয়োজনেও তৈরী হতে লাগল নতুন নতুন সব লোহার অস্ত্র-শস্ত্র। লোহার তৈরী লম্বা তরোয়াল, বল্লম, বর্শা, ঢাল প্রভৃতি অস্ত্র আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধ-কৌশল সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। রথে লোহার চাকায় গেঁথে দেওয়া হোত লোহার ধারালো ফলক যাতে যুদ্ধের সময়ে রথের ধারে-কাছে ঘেঁষতে না পারে কেউ।

লোহার ব্যবহার পরিবহণ-ব্যবস্থারও দ্রুত উন্নতি ঘটিয়েছিল। গাড়ীর চাকায় আর নৌকোয় কাঠের সঙ্গে লোহার পাত জোড়ার ফলে তা অনেক মজবুত আর দ্রুতগামী হয়ে উঠ্‌ল আর তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অনেক প্রসার ঘটল।

লোহা আবিষ্কারের পর থেকে লৌহশিল্প দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। লৌহশিল্পীদেরও কদর বেড়ে যায় সমাজের মধ্যে। লোহা দিয়ে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নতুন নতুন জিনিস তৈরী করে তারা মানুষকে আরও সভ্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। সব দেশেই লোহার তৈরী জিনিসের চাহিদা বেড়ে গেল। আর লোহার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ আমদানি হওয়ার ফলে মানুষের আথিক অবস্থারও দিন দিন উন্নতি হতে লাগল।

লৌহ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হোল সরল বর্ণমালার প্রচলন। লৌহ যুগের আগে লেখা বলতে ছিল মিশরের চিত্রলিপি আর মেসোপটেমিয়ার বাণমুখো লিপি। দুই-ই ছিল অত্যন্ত জটিল। তা আয়ত্ত করা ছিল

যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি সময়সাপেক্ষ। তাই সে যুগে লেখাপড়ার গোটা ব্যাপারটাই ছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া। তোমরা দেখেছ লৌহ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। কিছুটা লেখাপড়া না শিখলে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায় না। তাই ফিনিসীয় বণিকরা বাণ-মুখো লিপির সংস্কার করে মাত্র ২২টি বর্ণ দিয়ে এমন এক নতুন বর্ণমালা খাড়া করল যা দিয়ে মোটামুটি মনের সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। এই নতুন বর্ণমালা আবিষ্কারের ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে লেখাপড়া করা অনেক সহজ হয়ে গেল। শিক্ষা এখন আর কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষের কুক্ষিগত রইল না। লৌহ যুগ শিক্ষাকে মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিল।

লৌহ যুগের আগে দ্রব্যের বিনিময়ে জিনিসপত্তর কেনা-বেচা চলত। কোন কোন জায়গায় অবশ্য সোনা বা তামার পাত মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু লৌহ যুগে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়ে যায় প্রায় সর্বত্রই।

রাজতন্ত্রের প্রসার

লৌহ যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ উন্নতি করলেও বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ কিন্তু প্রায়ই লেগে থাকত। মাঝে মাঝেই যাযাবর উপজাতিরা প্রাচীন নগরগুলিতে হামলা চালিয়ে খাদ্যশস্য লুঠ করে নিয়ে যেত। তাই এই সব যাযাবর মানুষের হামলা ঠেকাবার জন্যেই প্রাচীন নগরগুলি পাঁচিল দিয়ে সুরক্ষিত করে রাখা হোত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আক্রমণকারীদের হামলা বন্ধ হয়নি। এই কারণেই প্রাচীন যুগের লোকেরা একজন শক্তিশালী নেতার অধীনে দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করেছিল। সেই নেতার নির্দেশ তারা সবাই মেনে চলত। এইভাবে বেশ কিছুদিন থাকার পর ক্রমে সেই নেতাই হয়ে উঠলেন তাদের রাজা। লৌহ যুগের আগেও অবশ্য কোন কোন দেশে রাজা ছিলেন। রাজার শাসনকে বলে রাজতন্ত্র। লৌহ যুগে এই রাজতন্ত্রের অনেক প্রসার ঘটে। এক একটা উপজাতি দলবদ্ধ হয়ে যেখানেই বাস করত সেখানেই ছিলেন একজন করে রাজা। প্রথম দিকে এই রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল না। কিন্তু পরে তা বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়।

অনুশীলনী

১। লৌহ যুগ কাকে বলে? লোহার প্রাচীনতম নিদর্শন কোথায় পাওয়া গিয়েছে?
২। লোহা আবিষ্কারের ফলে মানুষের কোন্ কোন্ দিক থেকে সুবিধে হয়েছে?
৩। লোহা কিভাবে সাধারণ মানুষকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল?
৪। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওপর লৌহ যুগের প্রভাব বর্ণনা কর।
৫। লৌহযুগে দেশে দেশে রাজতন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাবিলন

ভূমিকাঃ ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ছোট শহর---নাম ব্যাবিলন। সেখানকার রাজা হলেন হামুরাবি। তিনি ছিলেন শক্তিমান পুরুষ। তিনি যুদ্ধ করে মেসোপটেমিয়ার রাজ্যগুলিকে একত্র করে গড়ে তুললেন একটি বড় রাজ্য। রাজধানী ব্যাবিলনের নামানুসারে রাজ্যের নাম হোল ব্যাবিলনীয়া। মিশরীয় সভ্যতার মত সেখানেও এক চমৎকার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তার নাম ব্যাবিলনীয় সভ্যতা।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর পলিমাটিতে গড়া এই দেশ। এ দেশের উর্বর মাটিতে সোনা ফলে। তোমরা আগেই পড়েছ সুমেররা প্রথম মেসো-পটেমিয়ায় এসে জলার জল খাল কেটে নানাদিকে বইয়ে দিয়ে কিভাবে এখানে চাষবাস শুরু করেছিল। এইসব খনন আর জলসেচের ব্যবস্থা দেখলে বেশ বোঝা যায় সে যুগের লোকেরা কৃষিবিজ্ঞানের দিক থেকে রীতিমত উন্নত ছিল। পরবর্তী কালে ব্যাবিলনের লোকেরা এ বিষয়ে আরও উন্নতি করেছিল। হামুরাবির রাজত্বকালে সরকারী উদ্যোগে রাজ্যের মধ্যে বড় বড় খাল কেটে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সংঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

কৃষি ও বাণিজ্য

উৎপন্ন ফসলের মধ্যে প্রধান ছিল যব। জমি চাষ করত মজুরেরা। বিনিময়ে তারা পেত উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ। ভাগচাষ ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল অনেক জায়গায়। অনেক জমিদার আবার সারা বছর মাইনে-করা লোক দিয়ে চাষ করাতেন নিজের নিজের জমি। চাষের খরচপত্র সব জমিদারেরাই যোগাতেন। মাইনে হিসাবে বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল দেওয়া হোত মজুরদের। চাষের জমি ছাড়া আর ছিল পশুচারণ ভূমি এবং ফল ও সবজির বাগান। রাখালেরা গৃহ-পালিত পশুর পাল চরাত পশুচারণ ভূমিতে। বাগানে রোপণ করা হোত নানারকমের ফল ও সবজির গাছ। ঐসব বাগানে হোত পেঁয়াজ, রসুন, গাজর, এলাচ, খেজুর ইত্যাদি বিভিন্ন ফল ও সবজি। অনেকে আবার বাগান জমা দিয়ে দিত অন্য লোককে। বিনিময়ে মালিক পেত উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ।

জলপথেই চলত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের

অনেক কিছুই তখন ব্যাবিলনে পাওয়া যেত না। তাই সেই সব জিনিস তারা আমদানি করত বিদেশ থেকে। বিদেশেও রপ্তানি করত নিজেদের দেশের তৈরী অনেক কিছু। এই সব ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশই চলত দালালদের মারফত। তারা দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে মাল বিক্রি করত আর তার বিনিময়ে কমিশন হিসেবে পেত লাভের একটা অংশ।

মন্দির ও পুরোহিত সম্প্রদায়

ব্যাবিলনে তখন গড়ে উঠেছিল অনেক বড় বড় মন্দির। মন্দিরগুলি ছিল স্তুপের মত। সেই সব মন্দিরের অধীনে ছিল বহু দেবোত্তর সম্পত্তি। এই সব সম্পত্তি দেখাশোনার জন্যে নিযুক্ত থাকত প্রচুর মন্দির-কর্মচারী। বিচারের ভারও কিছুটা ন্যস্ত ছিল মন্দিরের পুরোহিতদের ওপর। তাঁরা সাক্ষীকে শপথবাক্য পাঠ করাতেন। মন্দিরের অধীনে থাকত বিদ্যালয় যেখানে ছাত্রদের লিখতে ও পড়তে শেখানো হোত। এই লেখকেরা লিখে রাখত রাজ্যের খুঁটিনাটি সব কিছু। তাদের সেই লেখা থেকেই আজ আমরা জানতে পেরেছি প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ইতিহাস।

ব্যাবিলনের পুরোহিতরা ছিলেন জ্ঞানী ও গুণী। তাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। পুরোহিতদের মধ্যেও আবার অনেক ভাগ ছিল। কারুর কাজ ছিল দেবতা কুপিত হলে মন্ত্রবলে তাঁকে শান্ত করা। কেউ আবার গণনা করে শুভ দিন-ক্ষণ স্থির করে দিতেন। আবার কেউ বা মানুষকে তার দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে নির্দেশ দিতেন তাকে কি করতে হবে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ব্যাবিলনের বাণমুখো লিপি ছিল খুবই জটিল। আগেই বলেছি এই লেখা আয়ত্ত করার জন্যে ছিল বিদ্যালয়। রাজারা এই সব লেখকদের দিয়ে নিজেদের রাজত্বকালের বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিখিয়ে রেখেছিলেন ইটের দেওয়ালে আর প্রস্তর ফলকে। তাদের বিভিন্ন ধরনের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, শিল্প, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সে যুগের মানুষ বেশ উন্নত হয়ে উঠেছিল।

হামুরাবির আইনের সংহিতা

তোমরা জান সভ্যজাতি সকলেই আইন মেনে চলে। এই আইনের বিধান প্রথম রচনা করেছিলেন সম্রাট হামুরাবি। কয়েকবছর আগে পারস্যদেশের পশ্চিম অঞ্চলে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ফলক পাওয়া গিয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেন এইটাই সম্রাট হামুরাবির আইনের সংহিতা অর্থাৎ

আইনের বই। এতে লেখা আছে বিভিন্ন অপরাধের জন্যে বিভিন্ন শাস্তির বিধান। যেমন, মন্দিরের কোন সন্ন্যাসিনী মদের দোকানে ঢুকলে তার শাস্তি ফাঁসী। কেউ কারুর বিরুদ্ধে খুনের মামলা করে তা প্রমাণ করতে না পারলে যে মামলা এনেছে তার হবে মৃত্যুদণ্ড। আরও অনেক বিধান ছিল এই আইনে যা আজকের যুগে শুনলে হাসি পাবে। যেমন, নতুন বাড়ীর ছাদ ভেঙ্গে পড়ে যদি গৃহস্বামীর কোন ছেলে মারা যায় তাহলে যে মিস্ত্রী সেই বাড়ীটা তৈরী করেছিল তার ছেলেকে ধরে ফাঁসী দেওয়া হবে। পরস্পর মারামারি করে কেউ কারুর একটা চোখ নষ্ট করে ফেললে, যে তা করেছে তার একটা চোখ কানা করে দেওয়া হবে। এছাড়া সমাজে বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্যে কে কত পারিশ্রমিক পাবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে এই আইনে।

হামুরাবি

হামুরাবির আইনের বই থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় সে যুগে সমাজে কত রকমের মানুষ বাস করত। সমাজে তখন প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল—বড়লোক, মধ্যবিত্ত এবং ক্রীতদাস। বড়লোক শ্রেণী বলতে বোঝাত দেশের বড় বড় জমিদার ও ব্যবসাদারদের। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা কোন-না-কোন একটি বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা-নির্বাহ করত। চিকিৎসক, পশুচিকিৎসক, দর্জি, স্থপতি প্রভৃতিরা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমাজে সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিল ক্রীতদাসেরা।

অনুশীলনী

১। প্রাচীন ব্যাবিলনে কৃষি-ব্যবস্থা কি রকম ছিল?

২। সেখানে পুরোহিতদের কি কি কাজ করতে হোত?

৩। হামুরাবি কে ছিলেন? তাঁর আইনের বইতে বিভিন্ন অপরাধের জন্যে কি ধরনের শাস্তির বিধান উল্লেখ করা আছে?

৪। ব্যাবিলনের সমাজে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষ বাস করত?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদী মিশর

মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তারঃ প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে দেখা যায় হিক্‌সস্‌ নামে এক বিদেশী জাতি মিশর জয় করে তাদের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছিল। পরে মিশরীয়রা হিক্‌সস্‌দের তাড়িয়ে দিয়ে আবার স্বাধীন হয়ে ওঠে। তখন মিশরীয়দের নেতা ছিলেন **আহমোস্‌**। তিনি ছিলেন থিব্‌সের রাজকুমার। আহ্‌মোস যুদ্ধ করতে করতে এশিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তাই দেখেই মিশরীয় রাজাদের মনে রাজ্যজয়ের বাসনা জেগে ওঠে। আহ্‌মোস্‌ মিশরের দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে কয়েকজন রাজাকে পরাস্ত করলেও তাদের সম্পূর্ণ বশীভূত করতে পারেননি। তার আগেই তিনি মারা যান।

আহ্‌মোসের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র **অ্যামেনহোটেপ**। তিনি নিউবিয়া জয় করে তা নিজের শাসনাধীনে নিয়ে এলেন। মিশরের দক্ষিণের প্রায় সব রাজ্য চলে এল তাঁর অধীনে আর সেখান থেকে প্রতি-বছর তিনি নিয়মিত কর আদায় করতে লাগলেন। লিবিয়ার সৈন্যরা সেই সময়ে তাঁর রাজ্যের সীমান্তে, প্রায়ই হামলা চালাতে শুরু করে। তাই তাদের শাস্তি দেবার জন্যে তিনি লিবিয়া আক্রমণ করেন। এশিয়ায় তাঁর রাজ্য ইউফ্রেটিস নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বিজিত রাজ্য-গুলির ওপর নিজের অধিকার কায়েম রাখার জন্যে তিনি অনেক দুর্গ তৈরী করে সেখানে সৈন্য মোতায়েন রেখেছিলেন।

অ্যামেনহোটেপের পর রাজা হলেন **তৃতীয় থাটমোস**। তাঁর সময়ে নিউবিয়ায় আবার বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তিনি তা সহজেই দমন করেন। এশিয়ায় মিশরের বিজিত রাজ্যগুলি একবার কর দেওয়া বন্ধ করে দিলে তৃতীয় থাটমোস তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে তিনি সেখানে নিজের মনোনীত একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে আসেন। মিশরের রাজার শক্তির পরিচয় পেয়ে অনেক দূর দূর দেশের রাজারাও ফ্যারাওকে (মিশরের রাজাকে ফ্যারাও বলা হোত) উপঢৌকন পাঠাতেন। এইভাবে ভূমধ্যসাগরের সমগ্র উত্তরাংশ জুড়ে মিশরের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

পুরোহিতদের ক্ষমতা

উপনিবেশ স্থাপনের ফলে বিদেশ থেকে মিশরের প্রচুর অর্থাগম হতে থাকে। মিশরের ফ্যারাওরা সেই অর্থ দিয়ে মিশরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে তাঁরা দেশের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির গড়ে তোলেন। প্রতিটি মন্দিরে থাকত প্রচুর ধনসম্পদ। প্রথম দিকে দেশের রাজারাই ছিলেন রাজ্যের প্রধান পুরোহিত। রাজ্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপারেও তাঁদের সব দেখাশোনা করতে হোত। কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে শাসন-বিষয়ক কাজ এত বেড়ে গেল যে, রাজারা তখন ধর্মীয় ব্যাপারে মন দেবার আর অবকাশ পেলেন না। তখন তাঁরা সে দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন পুরোহিতদের ওপর।

এইভাবে দেশের মধ্যে পুরোহিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হোল। আগেই বলেছি মিশরের প্রতিটি মন্দিরে ছিল প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি। তার তদারকির জন্যে পুরোহিতদের অধীনে নিযুক্ত থাকত বহু মন্দির-কর্মচারী। সে যুগে মিশরের লোকেরা ছিল ধর্মভীরু। তারা বিশ্বাস করত মারা যাবার পর পরলোকে গিয়েও মানুষ ইহজীবনের মত সব কিছু ভোগ করে। তারা মনে করত পুরোহিতরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁরা ইচ্ছে করলে পরলোকে মানুষের মঙ্গল হতে পারে। পরলোকে মানুষের মঙ্গলের জন্যে পুরোহিতরা পাপিরাস পাতায় মন্ত্র লিখে দিতেন। সেই মন্ত্রলেখা পাপিরাস পাতা মৃতদেহের সঙ্গে কবরে রেখে দিলে পরলোকে তার মঙ্গল হবে—এই ছিল মিশরীয়দের বিশ্বাস। ক্রমে এই মন্ত্রলেখা পুরোহিতদের একটা পেশা হয়ে দাঁড়াল আর শুধু এই মন্ত্র লিখেই পুরোহিতরা রীতিমত বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন। ইহজীবনে মানুষ যত অপরাধই করুক না কেন পুরোহিতদের টাকা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করালে পরকালে তার সব দোষ খণ্ডে যাবে—সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাসও সমাজে পুরোহিতদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রদেশের শাসনকর্তার চেয়ে স্থানীয় একজন পুরোহিতের ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি। বলা যেতে পারে ক্ষমতায় এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে রাজার পরেই ছিল পুরোহিতদের স্থান।

অনুশীলনী

১। কোন্ বিদেশী জাতি মিশর অধিকার করেছিল? কে তাদের তাড়িয়ে মিশরকে আবার স্বাধীন করেন? তাঁর রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

২। প্রথম অ্যামেনহোটেপের রাজ্য-জয়ের বিবরণ দাও।

৩। তৃতীয় থাটমোস কিভাবে এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন?

৪। মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায় কিভাবে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইরাণ

ভূমিকা ঃ ইরাণীরা আর্যজাতিরই একটি শাখা। ভারতীয় আর্যদের মত এরাও মূল বাসভূমি ছেড়ে একদিন ইরাণে (পারস্যে) এসে উপস্থিত হয়েছিল। প্রাচীন ইরাণী ভাষা তখন থেকে চালু হয় এদেশে। তারা এখানে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তবে তারা যে কোথা থেকে এখানে এসেছিল তা আজও সঠিকভাবে জানা যায় না। যুদ্ধ করে প্রতিবেশী রাজ্যের অনেকগুলিই তারা জয় করে নিয়েছিল। বিভিন্ন দেশ জয় করে তারা প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে আসে নিজেদের দেশে। আর তা দিয়ে তারা গড়ে তোলে বহু বড় বড় সব মন্দির। তখন ঝড়ের দেবতা ছিলেন ইরাণীদের কাছে খুব প্রিয়। তাই সেই ঝড়ের দেবতার উদ্দেশ্যেই মন্দিরগুলি সব উৎসর্গ করা হয়েছিল।

জোরোথুস্ট্রা ঃ আবেস্তা

ভারতের আর্যদের মত ইরাণীরাও প্রথমে দেবতাজ্ঞানে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করত, যাগযজ্ঞ করত, যজ্ঞের সময়ে পশুবলি দিত। পরে তাদের মধ্যে একজন ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম জোরোথুস্ট্রা। তিনি প্রচার করলেন—সমস্ত দেবতার ওপর সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর আছেন। তাঁর নাম আহুরা-মাজদা। তাঁর পুজোই শ্রেষ্ঠ পুজো। আহুরা-মাজদা হলেন স্বর্গের অধিপতি। পৃথিবীতে পাপপুণ্যের লড়াই সবসময়েই চলছে। আহুরা-মাজদা মানুষের জীবনে শক্তি দান করেন। কিন্তু অ্যারিম্যান লোভ দেখিয়ে মানুষকে সব সময়ে পাপে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। জোরোথুস্ট্রা বললেন, প্রত্যেক মানুষ বেছে নিক কে কোন্ পক্ষে থেকে লড়াই করবে। মৃত্যুর পরে পাপ-পুণ্যের বিচার হবে। কর্মফল কেউই এড়াতে পারবে না।

জোরোথুস্ট্রা

জোরোথুস্ট্রা মানুষের চরিত্রবলের উপরেই বেশি জোর দিতেন। তাঁর শিক্ষার সার মর্মগুলি সংকলন করে পরে একটি ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়। এই ধর্মগ্রন্থের নাম আবেস্তা।

ইরাণীরা মনে করে আগুন পবিত্রতার প্রতীক। তাই তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সব সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখে। তারা পাহাড়ের চূড়োয় খোলা আকাশের নীচে আগুন জ্বালিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করে।

কেউ মারা গেলে ইরাণীরা তার মৃতদেহ পোড়ায় না বা কবর দেয় না। শহর বা গ্রামের বাইরে উঁচু কোন জায়গা তারা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রেখে দেয়। কেউ মারা গেলে মৃতদেহটিকে তারা সেইখানে ফেলে রেখে আসে। কাক-চিল-শকুন সেই মৃতদেহ ছিঁড়ে খায়। তারা মনে করে—মৃত্যুর পরেও এই দেহ যদি জীবকুলের সামান্য প্রয়োজনেও লাগে তাতে ক্ষতি কি?

এক সময়ে আরবের মুসলমানেরা ইরাণীদের দেশ জয় করে নেয়। তখন অনেকেই ধর্মচ্যুতির ভয়ে ভারতে চলে আসে। এরাই ভারতের পার্শী সম্প্রদায়। আজও তারা তাদের নিজস্ব ধর্মমত ও রীতিনীতি মেনে চলে।

অনুশীলনী

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) ইরাণীরা কারা? তারা কিসের পুজো করত?

(খ) আহুরা-মাজদা কে? তাঁর কথা কে প্রথম বললেন?

(গ) আবেস্তা কি? তাতে কি আছে?

২। জোরোথুস্ট্রা কে ছিলেন? তিনি কি প্রচার করেছিলেন?

৩। ইরাণীদের মৃতদেহ কিভাবে সৎকার করা হয়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিব্রু জাতি

ভূমিকা ঃ সেই প্রাচীন যুগে আর একটি বিশিষ্ট জাতি ছিল---তার নাম হিব্রু জাতি। এই হিব্রু জাতিই পরে ইহুদি নামে পরিচিত হয়। তোমরা দেখেছ কোন জাতি রাজ্যজয় করে, আবার কোন জাতি বাণিজ্য করে বড় হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করে বড় হয়েছিল এই ইহুদি জাতি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, পৃথিবীর কোথাও তারা আশ্রয় পায়নি। নিরাশ্রয় অবস্থায় এক দেশ থেকে আর এক দেশে তারা কেবল ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছে।

মিশরে ইহুদিদের বসতি স্থাপন

ইহুদিরা আগে আরবের মরুভূমিপ্রান্তে বাস করত। পশুপালন ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। পশুর পাল নিয়ে যাযাবরের মত তারা ঘুরে বেড়াত বিভিন্ন দেশে। এই ইহুদিদের একটি দল আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয় মিশরে। তার আগেই পশ্চিম এশিয়ার হিক্‌সস্ নামে আর একটি যাযাবর জাতি মিশরের ঘরোয়া বিবাদের সুযোগ নিয়ে মিশরের সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছিল। বলা যেতে পারে জাতি হিসেবে এই হিক্‌সস্ আর ইহুদিরা ছিল প্রায় সমগোত্রীয়। তাই ইহুদিরা যখন মিশরে প্রবেশ করে তখন হিক্‌সস্‌রা তাদের কোন বাধা দেয়নি, বরং সাদরে আশ্রয় দিয়েছিল তাদের সেখানে। তাদের আমলে যোশেফ নামে ইহুদিদের একজন মিশরের শাসনকর্তা পর্যন্ত হয়েছিলেন। এই পদ অত্যন্ত সম্মানের। ফ্যারাও-এর পরেই ছিল তাঁর স্থান।

ইহুদি নির্যাতন

মিশরীয়দের কাছে হিক্‌সস্‌রা ছিল বিদেশী। এই বিদেশী শাসন তাদের কাছে ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। ফলে দেশের মধ্যে শুরু হয়ে গেল এক জাতীয় আন্দোলন। মিশর থেকে হিক্‌সস্ জাতি বিতাড়িত হোল। হিক্‌সস্‌রা চলে গেলেও ইহুদিরা কিন্তু মিশরেই থেকে গেল। হিক্‌সস্‌দের মত ইহুদিদেরও সহ্য করতে পারত না মিশরীরা। তাই মিশর আবার স্বাধীন হবার পর শুরু হোল ইহুদিদের ওপর নির্যাতন। ফ্যারাও তাদের গোলামের মত খাটাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তাদের বংশ যাতে না-বাড়তে পারে সেইজন্য ফ্যারাও নির্দেশ দিলেন ইহুদিদের কারুর ঘরে ছেলে হলে তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলতে হবে।

ইহুদি ধর্মগুরু মুসা

এই অবস্থার মধ্যে মিশরে জন্মগ্রহণ করলেন ইহুদি ধর্মগুরু মুসা। শৈশবে মুসা আশ্চর্য উপায়ে রক্ষা পেয়েছিলেন। সেখানে পাহাড়ের ধারে পশুপাল চরাতে গিয়ে তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেলেন। ঈশ্বর যেন তাঁকে বলছেন,—"মুসা, আরামপ্রিয় ইসরাইলেরা মিশরে বড় কষ্ট পাচ্ছে, তুমি তাদের কানান দেশে নিয়ে যাও। ঐ দেশ তাদের—এই আমার নির্দেশ"। জেনে রাখ মিশরে ইহুদিদের ইসরাইল বলা হোত আর প্যালেস্টাইনের নাম ছিল তখন কানান।

মুসার নেতৃত্বে ইহুদিদের মিশর ত্যাগ

মুসা মিশরে গিয়ে অনেক চেষ্টায় ফ্যারাওকে সন্তুষ্ট করে ইহুদিদের মুক্ত করে নিয়ে চললেন। কিন্তু হঠাৎ ফ্যারাও-এর মতি ঘুরে গেল। তাদের বন্দী করে আনবার জন্যে তিনি একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। পথে পড়ল লোহিত সাগর। ঈশ্বরের নির্দেশমত সাগরের জল দুদিকে সরে গিয়ে মুসার জন্যে যেন জায়গা করে দিল। মুসা দলবল নিয়ে নিরাপদে পার হয়ে গেলেন। কিন্তু ফ্যারাও-এর সৈন্য পার হতে গিয়ে সমুদ্রের জলে সব ভেসে গেল। তারপর সিনাই পাহাড়ের কাছে পৌঁছে মুসা ঈশ্বরের দশটি আদেশ সঙ্গীদের শোনালেন। আদেশগুলি হোল— (১) ঈশ্বর এক, কেবল তাঁরই পুজো করবে। (২) পুতুল পুজো করবে না। (৩) বৃথা ঈশ্বরের নাম নেবে না। (৪) সপ্তাহে একদিন কাজকর্ম বন্ধ রেখে ধর্মকর্ম করবে। (৫) পিতামাতাকে ভক্তি করবে। (৬) নরহত্যা করবে না। (৭) চরিত্র নির্মল রাখবে। (৮) চুরি করবে না। (৯) মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। (১০) প্রতিবেশীর সম্পদ দেখে ঈর্ষা করবে না।

তারপর ইহুদিরা এসে পৌঁছল ভগবানের প্রতিশ্রুত দেশ কানান বা প্যালেস্টাইনে। তারা সেখানে গড়ল ধর্মরাজ্য। ইহুদি রাজাদের মধ্যে **শল, ডেভিড ও সলোমন** পর পর রাজত্ব করেন। সলোমনের মৃত্যুর পর নানা জাতির আক্রমণে রাজ্য হারিয়ে ইহুদিরা আবার পথে নামল। তখন থেকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তারা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। আজও পৃথিবীর সর্বত্র ইহুদিরা বাস করছে।

ইহুদি জাতির প্রধান গৌরব তাদের ধর্ম। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্য জাতি সকলেই বহু দেব-দেবীর পুজো করত। ইহুদি ধর্মগুরু **আব্রাহাম**ও মুসার মতই বললেন, ঈশ্বর এক, বহু নয়। সেই ঈশ্বরের নাম **যিহোবা**।

ইহুদি জাতির ধর্মগুরুদের নানা কাহিনী, ধর্মমত ও উপদেশ বাইবেলের প্রথম অংশে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ অংশের নাম ওল্ড টেস্টামেন্ট। বাইবেল খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ। খৃষ্টান ধর্মের মূলে রয়েছে ইহুদি ধর্ম। খৃষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশুও এই ইহুদিদের ঘরেই জন্মেছিলেন।

অনুশীলনী

১। ইহুদিরা যখন প্রথম মিশরে প্রবেশ করে তখন কারা সেখানে রাজত্ব করছিল? তারা মিশর থেকে বিতাড়িত হবার পর মিশরে ইহুদিদের অবস্থা কি হয়েছিল?

২। মুসা কে ছিলেন? তিনি ঈশ্বরের কি আদেশ পেয়েছিলেন?

৩। মুসা কিভাবে ইহুদিদের মুক্ত করেছিলেন?

৪। মুসা ঈশ্বরের যে দশটি আদেশ সঙ্গীদের শুনিয়েছিলেন সেই দশটি আদেশ কি?

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) একজন ইহুদি মিশরের শাসনকর্তা হয়েছিলেন, তাঁর নাম কি?

(খ) ইহুদিদের প্রতি মিশরের ফ্যারাওয়ের কি নির্দেশ ছিল?

(গ) মিশরে ইহুদিদের কি বলা হোত?

(ঘ) কানান দেশটি কোথায়?

(ঙ) আব্রাহাম কে? তিনি কি প্রচার করেছিলেন?

(চ) ইহুদিদের ঈশ্বরের নাম কি?

(ছ) ওল্ড টেস্টামেন্ট কাকে বলে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রীস

ক্রীটের প্রভাবঃ ঈজিয়ান সাগরের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে ছোট একটি দ্বীপ, নাম তার ক্রীট। গ্রীক সভ্যতার বিকাশের আগেই এই দ্বীপে একটি বিশিষ্ট সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এখানকার লোকেরাই প্রথম ঈজিয়ান সাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। নৌ-বাণিজ্যে তাদের তখন জুড়ি ছিল না। গ্রীস, নীল নদের উপত্যকা, সিরিয়া প্রভৃতি

দেশে ছিল তাদের একচেটিয়া কারবার। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সব দিক থেকেই তারা হয়ে উঠেছিল রীতিমত উন্নত। এদের সংস্পর্শে এসে গ্রীকরাও ক্রমে নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল। তাদের শিল্প, ভাস্কর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ এমন কি সমাজ-জীবনেও পড়ল ক্রীট সভ্যতার ছাপ।

হোমারের যুগ

হোমার ছিলেন গ্রীসদেশের মহাকবি। আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ ও মহাভারত, সেই রকম ইলিয়াদ ও ওদিসি গ্রীসের দুটি

মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের রচয়িতা ছিলেন হোমার। তিনি ছিলেন অন্ধ। সেই অবস্থায় এক মুচির দোকানে বসে তিনি কবিতায় লেখা ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী আবৃত্তি করতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও আবৃত্তির ধরন এমনই চমৎকার ছিল যে, লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনত। ইলিয়াদে আছে ট্রয় অভিযানের কাহিনী আর ওদিসিতে আছে বিজয়ী বীর ইউলিসিস্ কিভাবে পথে দলছাড়া হয়ে নানা বিপদের ভেতর দিয়ে অবশেষে স্বদেশে ফিরলেন তারই মনোরম বৃত্তান্ত।

হোমার

সে যুগে গ্রীসের সভ্যতা এবং সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল হোমারের রচনা থেকে তার অনেক কিছুই আমরা জানতে পারি। গ্রীকরা তখন ছিল অত্যন্ত ভদ্র, নম্র এবং অমায়িক। বয়স্ক ব্যক্তি, স্ত্রীলোক এবং বিদেশীদের প্রতি তাদের ব্যবহার ছিল সৌজন্যপূর্ণ। প্রাণখোলা স্ফূর্তিবাজ লোক ছিল তারা। নাচ, গান, খেলাধুলো আর শিকার করে অবসর সময় কাটাতে তারা ভালবাসত।

হোমারের কাব্যের মধ্যে বহু দেব-দেবীর অদ্ভুত অদ্ভুত কীর্তি-কাহিনীর উল্লেখ আছে। চেহারায় চরিত্রে তাঁরা মানুষের মতই, তবে তাঁরা ছিলেন অমর। গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে অলিম্পাস পর্বতই দেবতাদের বাসস্থান। দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জিউস। তাঁর হাতে থাকত বজ্র। এথেনা হলেন জ্ঞানের দেবী আর অ্যাপোলো হলেন সূর্যদেবতা।

নগররাষ্ট্র

প্রথম দিকে গ্রীকেরা গ্রামে বাস করত। গ্রীসের মানচিত্র দেখলে মনে হবে গ্রীস দেশটি যেন পাহাড়-ঘেরা কয়েকটি উপত্যকায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি উপত্যকায় বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল কয়েকটি গ্রাম। পরে নিজেদের প্রয়োজনে গ্রামগুলি একত্র হয়ে গড়ে তোলে একটি করে নগর। এইভাবে প্রতিটি উপত্যকায় গড়ে উঠ্‌ল একটি করে ছোট নগররাষ্ট্র। পাহাড় তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল বলেই সমস্ত গ্রীস জুড়ে জনবহুল এক বিশাল রাষ্ট্র সেখানে গড়ে ওঠেনি। নগররাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যা ছিল খুবই কম। গ্রামের লোকেরা মিলেই নগররাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল।

রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পর কিন্তু তারা আর কোন একজনের শাসন মেনে চলতে রাজী হোল না। তাদের অভিমত হোল নাগরিকরাই হবে রাষ্ট্রের কর্ণধার। রাজ্য শাসন বলতে যা কিছু তা সবই করত একজন নেতার অধীনে রাষ্ট্রের প্রজারা। একেই বলে গণতন্ত্র। ভেবে দেখ আজ থেকে কত হাজার বছর আগে গ্রীসে গণতন্ত্র চালু হয়েছিল।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত। গ্রীসের এই নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে বনিবনা না থাকলেও সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের মধ্যে মনের মিল ছিল চমৎকার। তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, তারা সকলে একই পূর্বপুরুষ হেলেনের বংশধর। এই সূত্রে বংশগত আত্মীয়তা তারা মনে-প্রাণে অনুভব করত। তাই ঝগড়া-ঝাঁটি সত্ত্বেও তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি কোনদিন। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ছিল অব্যাহত।

উপনিবেশ স্থাপন

গ্রীসের প্রতিটি নগররাষ্ট্রে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে দেশে দেখা দিল খাদ্যসঙ্কট। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাওয়াবার মত পর্যাপ্ত ফসল ফলে না গ্রীসে। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে চাই নতুন নতুন জায়গা যেখানে আছে পর্যাপ্ত পানীয় জল, ফসল ফলাবার মত উর্বর জমি, আর পশুদের চরে খাবার মত উপযুক্ত তৃণভূমি। অনুরূপ জায়গার সন্ধানে দলে দলে বেরিয়ে পড়ল গ্রীসের মানুষ। এইভাবে ভূমধ্যসাগর, ঈজিয়ান সাগর আর কৃষ্ণসাগরের তীরে গড়ে উঠ্‌ল গ্রীক উপনিবেশ। এই উপনিবেশগুলি ছিল স্বাধীন। কিন্তু যেহেতু তারা গ্রীক সেই হেতু গ্রীসের মূল নগররাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তাদের একটা অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল।

এথেন্স ও স্পার্টা

গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল এথেন্স, স্পার্টা, কোরিন্থ ও থিবস। এই সব অঞ্চলের আইন-কানুন, শাসন-নিয়ম সবই ছিল পৃথক্। কোথাও ছিল রাজার শাসন, আবার কোথাও দলপতির নেতৃত্বে সাধারণ লোকেরাই শাসনকাজ চালাত। নগরবাসীদের চাল-চলন, কাজকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-ব্যবহার সবই ছিল নিয়মে বাঁধা।

এথেন্সের জীবনযাত্রা

এথেন্সে শিশু-শিক্ষার ভার পিতা-মাতার ওপর ছিল না, সে ভার নিতেন শিক্ষাগুরু নিজে। তাঁদের নিজস্ব শিক্ষালয় ছিল। সেখানে শিক্ষাগুরু ছেলেদের প্রথমে লেখাপড়া শেখাতেন। তারপর শেখাতেন দেশের ইতিহাস, গ্রীকজাতির বীরত্বের কাহিনী, গাথা, কবিতা আর সেই সঙ্গে গান ও বেহালা বাজানো। এইভাবে শিক্ষার ভেতর দিয়ে ছেলেদের মনে জাগিয়ে তুলতেন দেশপ্রেম। তাছাড়া সুস্বাস্থ্য ও মনের আনন্দের জন্যে কুস্তি-কসরত আর ছবি আঁকাও শেখাতেন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হোত নিজের নিজের পরিবারের মধ্যে। গৃহস্থালির কাজের ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হোত। সেই সঙ্গে তারা শিখত লেখাপড়া, সুতাকাটা, কাপড় বোনা ও এমব্রয়ডারীর কাজ। গান-বাজনাও কিছু কিছু শেখানো হোত তাদের।

চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছিল ছেলেদের শিক্ষার কাল। ব্যায়ামের দ্বারা সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ গঠনের জন্যে আরও দুবছর নির্দিষ্ট ছিল। তারপর দেশের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে নাগরিকবিধি ও যুদ্ধনীতি শিখে আঠার বছর বয়সে তারা যোগ দিত নগররক্ষী দলে। তখন নগর সীমান্তে থেকে তাদের নগর রক্ষা করতে হোত। এইভাবে তেইশ বছর বয়সে তারা উপযুক্ত নাগরিক বলে গণ্য হোত। তখন তারা শাসনকাজে যোগদানের অধিকার লাভ করত। তাদের হাতে থাকত প্রচুর অবসর সময়। এথেন্সের লোকেরা হাটে-বাজারে গল্প-গুজব করে তাদের অবসর সময় অতিবাহিত করত। আজকের দিনের মত সে যুগে খাওয়াপরার চিন্তায় কাউকেই বিশেষ মাথা ঘামাতে হোত না। বিকেল বেলা তারা রাজদরবারে মিলিত হয়ে রাজকার্যে সাহায্য করত, কেউ বা আবার বিচারসভায় জুরির আসনে বসে বিবাদ-বিসংবাদ মেটাত।

রাজ্যের মধ্যে রাজা ছিলেন একাধারে প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারক ও প্রধান পুরোহিত। এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও রাজা কিন্তু নিজের খুশী মত চলতে পারতেন না। 'সমিতি' ও 'জনসভার' পরামর্শ নিয়ে তাঁকে সব কাজ করতে হোত। 'সমিতি' গঠিত হোত নগরের গণ্যমান্য লোকজনকে নিয়ে আর 'জনসভার' সভ্য ছিল নগরের প্রত্যেকটি স্বাধীন নাগরিক। 'সমিতির' সঙ্গে পরামর্শ করে যা ঠিক হোত তাতেও 'জনসভার' মতামত নিতে হোত।

স্পার্টার জীবনযাত্রা

স্পার্টার শিক্ষার নিয়ম ছিল আরও কঠোর। নামেই ছিল লেখাপড়া—যুদ্ধবিদ্যাকেই সেখানে বড় মনে করা হোত। স্পার্টার একজন আইনকর্তা ছিলেন—তাঁর নাম **লাইকারগাস**। স্পার্টার প্রত্যেকটি লোককে পেশাদার যোদ্ধা হতে হবে—তিনি এই নিয়ম চালু করেছিলেন। রোগা বা বিকলাঙ্গ শিশু স্পার্টার সমাজে অবাঞ্ছিত। তাই শৈশবেই তাদের মেরে ফেলা হোত।

মাত্র সাত বছর বয়সে শিশুকে মায়ের কোল থেকে সরকারী শিক্ষালয়ে নিয়ে আসা হোত। সেখানে কঠোর নিয়মের মধ্যে দৌড়-ঝাঁপ, ব্যায়াম, ঘোড়ায় চড়া, তীর, বর্শা ও অসিচালানো প্রভৃতি শিখে তারা হয়ে উঠ্‌তো দুর্জয় ও রণপিপাসু। কদর্য আহার, শীত-গ্রীষ্মে খালি পায়ে চলা, খোলা মাটিতে শোয়া, এমন কি বেত্রাঘাতে জর্জরিত হওয়া—সবই তাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হোত। ছোটবেলা থেকে মেয়েদের দেহ সুগঠিত হলে তবেই তারা ভবিষ্যতে সুস্থ ও সবল সন্তানের জননী হতে পারবে। তাই ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও নিয়মিত শারীর শিক্ষা দেওয়া হোত।

শুধু শরীরচর্চার ওপর অত্যধিক জোর দেওয়ার জন্যে স্পার্টার লোকদের মনটা হয়ে উঠেছিল রুক্ষ ও কঠিন। দয়া-মায়ার লেশমাত্র ছিল না তাদের মনে। ব্যক্তিগত জীবনেও তারা ছিল অত্যন্ত নোংরা। প্রায়ই সবাই ছিল নিরক্ষর। মানুষের মনের উন্নতির দিকে এতটুকু নজর ছিল না তাদের। তাদের সুন্দর সুগঠিত দেহের ভেতরে লুকিয়ে ছিল এক কদর্য বর্বর মন। তাই তারা শুধু যুদ্ধ জয়ই করে গেছে, গ্রীক-সভ্যতার মূলে কোন স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারেনি।

এথেন্স বনাম স্পার্টা

প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টাই ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। বহু প্রাচীনকাল থেকে অন্যান্য গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টাকেই তাদের নেতার আসনে বসিয়েছিল। তাই পারসিকরা যখন গ্রীসদেশ আক্রমণ করে তখন অন্য সব গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে পারসিক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু স্পার্টার নেতারা ছিলেন অত্যন্ত হীন মনোভাবাপন্ন। পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাদের এই হীন মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার ফলে গ্রীক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে।

অপর দিকে এথেন্সই তখন মরণপণ সংগ্রাম করে গ্রীসকে শত্রু কবল থেকে মুক্ত করে। তাই এথেন্সকে বলা হয় গ্রীসের মুক্তিদাতা। যুদ্ধ শেষে জননায়ক **থেমিস্টোক্লিসের** নেতৃত্বে এথেন্সবাসী এথেন্স নগরীকে আবার নতুন করে গড়ে তোলে। চারদিকে শক্ত পাঁচিল তুলে তারা এথেন্সকে গ্রীসের সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরীতে পরিণত করে। এই থেমিস্টোক্লিসের জন্যেই এথেন্স নৌ-বলে বলীয়ান হয়ে ব্যবসায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। তারপর **পেরিক্লিসের** রাজত্বকালে ধনে-মানে, শিক্ষায়-দীক্ষায় এথেন্স হয়ে উঠল গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র। তাই গ্রীসের নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ল এথেন্সের ওপর।

এককালে স্পার্টাই ছিল গ্রীকদের নেতা। কিন্তু পারস্য যুদ্ধের পর থেকে স্পার্টার প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস ও এথেন্সের শক্তি ও জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রচণ্ড নৌ-বলের সাহায্যে এথেন্স স্থল ও জলপথে গ্রীসের সর্বত্র তার আধিপত্য বিস্তার করলে স্পার্টা স্বভাবতঃই ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া স্পার্টা আরও ভাবল, যে প্রচণ্ড গতিতে এথেন্স নিজের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে তা রোধ করতে না পারলে স্পার্টাকেই হয়ত শেষ পর্যন্ত সে গ্রাস করে ফেলবে। তাই বলা যেতে পারে এই ঈর্ষা ও আতঙ্কের জন্যেই স্পার্টাকে শেষ পর্যন্ত এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে **পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ** নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে। গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক **থুকিদীদিস** এই যুদ্ধের বিবরণ লিখে গিয়েছেন।

সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে স্পার্টার সৈন্য ছিল এথেন্সের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু নৌ-বলে ও অর্থবলে এথেন্স ছিল স্পার্টার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই যুদ্ধ একটানা চলেনি। চলেছিল বারে বারে। মাঝে মাঝে উভয় পক্ষে সন্ধি হয়েছে, যুদ্ধ বিরতি হয়েছে। সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে আবার যুদ্ধ হয়েছে উভয়পক্ষে। এইভাবে সাতাশ বছর যুদ্ধের পর অবশেষে স্পার্টার হাতে এথেন্সের পরাজয় ঘটল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে এথেন্সের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায় আর তার যাবতীয় নৌবহর বাজেয়াপ্ত করা হয়। এথেন্সের পরাজয়ের ফলে গ্রীসে আবার ফিরে এল স্পার্টার প্রাধান্য।

সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এথেন্সের অবদান

পেরিক্লিস ছিলেন এথেন্সের সবচেয়ে বড় নেতা। তিনি গুণী ব্যক্তিদের খুব সমাদর করতেন। তাই তাঁর রাজত্বকালে তিনি বহু নামকরা দার্শনিক,

সাহিত্যিক, ভাস্কর ও শিল্পীর একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন এথেন্সে। সে যুগের বিখ্যাত দার্শনিক **সক্রেটিস** ও প্লেটো ছিলেন এথেন্সেরই মানুষ।

সক্রেটিস

এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন **ইস্কাইলাস**। তিনিই প্রথম পৌরাণিক চরিত্রের মুখে সংলাপ জুড়ে অভিনয় করার রীতি দেখিয়েছিলেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত নাটক হল আগামেম্‌নন্ ও পার্সিয়াহ। দুটোই করুণ রসের অর্থাৎ দুঃখের নাটক। এছাড়া আরও যে সব নাট্যকার ছিলেন তাঁদের মধ্যে নাম করা হলেন **ইউরিপাইদিস্, সফোক্লিস** আর **অ্যারিস্তোফ্যানিস**। এঁদের মধ্যে অ্যারিস্তোফ্যানিসই কেবল হাসির নাটক লিখতেন।

এ যুগে বড় বড় মন্দির আর সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়ার কাজেও এথেন্সের শিল্পীরা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। **পার্থেনন মন্দির** আর **এথেনার** মূর্তি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। এ যুগের একজন বিখ্যাত ভাস্করের নাম **প্রাক্‌সিতেসিস**। দেবদূত **থার্মিস** ও দানব সাতির-এর মূর্তি তিনি গড়েছিলেন। মূর্তি দুটির গড়ন এমন নিখুঁত ও সুন্দর যে আজও মনে হয় বুঝি তাদের তুলনা নেই।

হেরোদোতাস

হেরোদোতাসকে বলা হয় ইতিহাসের জনক। তিনি পারসিকদের গ্রীস অভিযানের কাহিনী সুন্দর ভাষায় লিখে গিয়েছেন। তিনি অনেক দেশ ঘুরে নিজের চোখে যা দেখেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বইয়ে। তাই ইতিহাস ছাড়াও বহু মজার মজার কাহিনী জানতে পারা যায় তাঁর বই থেকে। তার লেখার মধ্যে কোন কিছুই তাঁর নিজের মনগড়া নয়, সবই তাঁর চোখে দেখা বাস্তব ঘটনা। তাই যেন গোটা একটা যুগের ইতিহাস ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়।

হেরোদোতাস

গ্রীকেরা তখন বহু দেব-দেবীর পুজো করত। শিল্পীদের গড়া নানা দেবদেবীর মূর্তি থেকে তা আমরা জানতে পারি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকেও তারা পুজো করত। কিন্তু **ধর্মীয় কুসংস্কারকে** তারা তখনও সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তারা দৈববাণীতে বিশ্বাস করত; অর্থাৎ তারা মনে করত বিপদে-আপদে দেবতার মন্দিরে গিয়ে ধরনা দিলে দেবতা প্রতিকারের উপায় বলে দেন।

পেরিক্লিস্

পেরিক্লিস ছিলেন এথেন্সের একজন জাতীয় নেতা। বলা যেতে পারে তাঁরই নেতৃত্বে এথেন্সের যাবতীয় উন্নতি ঘটেছিল। আগে গ্রীসের শাসনক্ষমতা ছিল বড়লোকদের হাতে। পেরিক্লিসই তাদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্। শুধু তাই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের তিনি বিশেষ সমাদর করতেন।

সফোক্লিস্

সফোক্লিস ছিলেন একজন মস্ত বড় কবি ও নাট্যকার। কবি হিসেবে তিনি ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। তাঁর স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তিনি তাঁর কাব্যে অমর করে রেখে গিয়েছেন। নাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল অনেক বেশি। তাঁর লেখা নাটক সবই বিয়োগান্ত অর্থাৎ দুঃখের। তাঁর প্রসিদ্ধ নাটকের নাম আন্তিগোনে।

সক্রেটিস

সক্রেটিস ছিলেন একজন পরম জ্ঞানী ও বিনয়ী পুরুষ। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। তিনি বলতেন যা কিছু বিশ্বাস করবে, আগে বিচার করে দেখবে তা বিশ্বাস-যোগ্য কিনা। দেশের কুরীতি দূর করা, মানুষের ভুল সংশোধন করা, বালকদের ন্যায়পথে চালানো ও সৎশিক্ষা দেওয়া—এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এই জন্যে তিনি পথে, মাঠে, বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যুক্তি দিয়ে তিনি মানুষের সব প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতেন। কিন্তু দেশের একদল গোঁড়া লোক সক্রেটিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনল যে, তিনি ঈশ্বর-বিরোধী। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হোল। সত্যের জন্যে সক্রেটিস কারাগারে বিষপান করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

প্রথম ইতিহাস লেখেন কে জান? তাঁর নাম হেরোদোতাস।

তাই তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তিনিও এই যুগেরই লোক। আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন থুকিদীদিস। তিনি পোলোপনেসিয়ার যুদ্ধের বিবরণ লিখে গিয়েছেন।

থুকিদীদিস্

ম্যাসিডন

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

গ্রীসের উত্তরে ছোট্ট একটি পার্বত্য প্রদেশ—নাম ম্যাসিডন। ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ। গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে তখন কোন বনিবনা ছিল না। সেই সুযোগে ফিলিপ একে একে ঐ নগররাষ্ট্রগুলি অধিকার করে সমস্ত গ্রীসের অধিপতি হয়ে উঠলেন। ফিলিপের মৃত্যুর পর ম্যাসিডনের রাজা হলেন তাঁর ছেলে আলেকজাণ্ডার। তিনি ছিলেন খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাই রাজা হবার পর তিনি বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে। পথে পড়ল পারস্যের সাম্রাজ্য। পারস্য সম্রাটকে হারিয়ে তিনি জয় করে নিলেন তাঁর রাজ্য।

তারপর হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আলেকজাণ্ডার প্রবেশ করলেন ভারতবর্ষে। উত্তর ভারত তখন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। সেই সব রাজ্যের রাজাদের মধ্যে ছিল না কোন বনিবনা। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে স্বীকার করে নিলেন আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা। তাঁরই সাহায্যে আলেকজাণ্ডার বিতস্তা নদী পার হয়ে পুরুর রাজ্য আক্রমণ করতে এগিয়ে গেলেন। পুরু কিন্তু অম্ভির মত বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করার পাত্র ছিলেন না। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধের পর পুরু বন্দী হলেন আলেকজাণ্ডারের হাতে। বন্দী অবস্থাতেও পুরুর বীরোচিত ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আলেকজাণ্ডার পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। আলেকজাণ্ডারের

আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযান
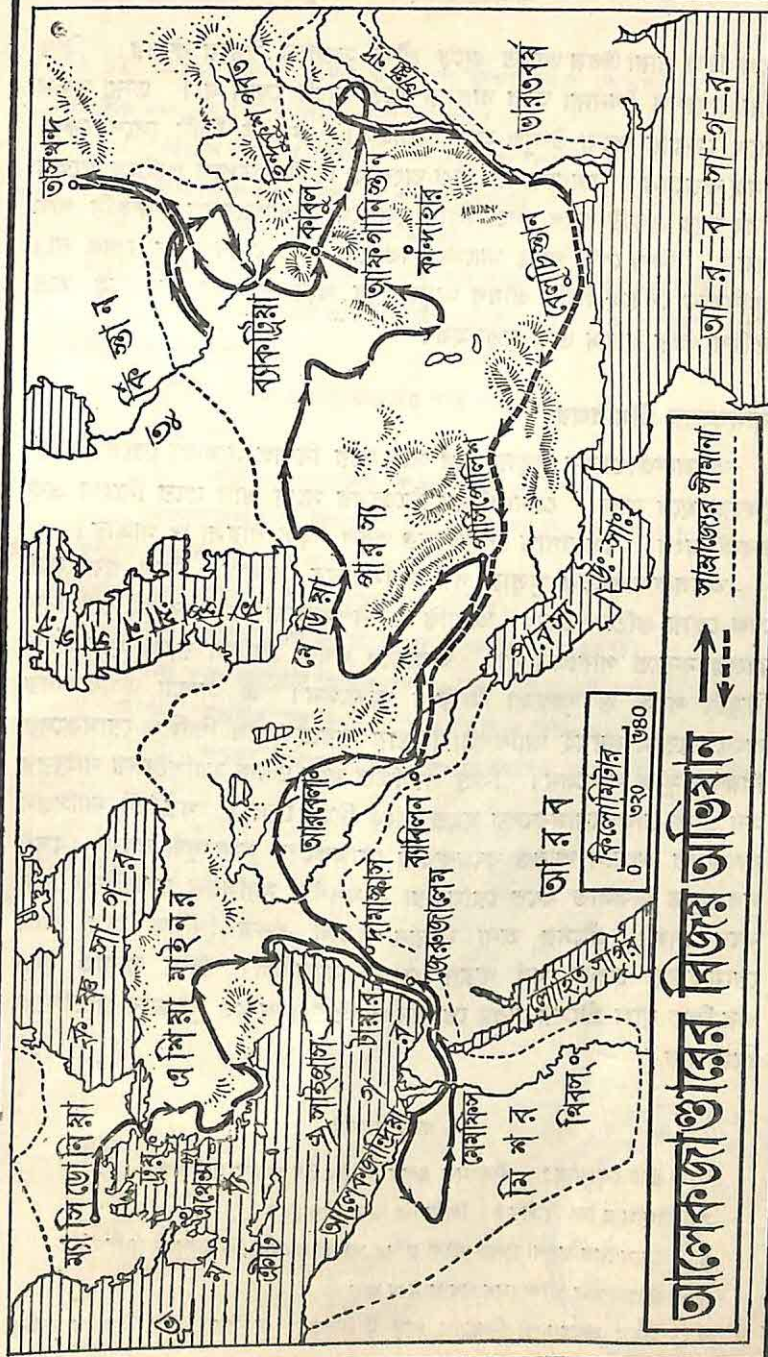
ইচ্ছে ছিল সারা উত্তর ভারত জুড়ে গ্রীক সাম্রাজ্য বিস্তার করার। কিন্তু তাঁর রণক্লান্ত সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে রাজী হোল না। তারা তখন দেশে ফেরার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কাজেই তিনি দেশে ফেরা মনস্থ করলেন। সেনাদলের এক অংশকে তিনি জলপথে পাঠিয়ে দিলেন এবং আর একটি অংশ নিয়ে তিনি স্থলপথে বেলুচিস্তানের মরুভূমি পার হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলেকজাণ্ডারের আর দেশে ফেরা হোল না। ব্যাবিলনে পৌঁছে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং সেখানেই মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

রোমকদের গ্রীসবিজয়

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন এক একটি অংশ। সেনাপতি সেলুকসের ভাগে পড়ল পারস্য ও গান্ধার।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ম্যাসিডনের সিংহাসন নিয়ে শুরু হয়ে গেল জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অশান্তি ও বিশৃঙখলার মধ্যে কেউই বেশিদিন রাজত্ব করতে পারলেন না। অবশেষে পঞ্চম ফিলিপ রাজা হয়ে দেশে কিছুটা শান্তি ও শৃঙখলা ফিরিয়ে আনলেন। ঐ সময়ে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রোম ক্রমেই আধিপত্য বিস্তার করছে দেখে ফিলিপ রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে তাঁকে ম্যাসিডনের বাইরের সব গ্রীক রাজ্য রোমকদের হাতে ছেড়ে দিতে হোল। পরবর্তী ম্যাসিডন রাজাদের আমলে আরও কয়েকবার রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। সেই সব যুদ্ধে জয়লাভ করে রোমকরা শেষপর্যন্ত ম্যাসিডন রাজ্যটিকে গ্রাস করে নেয়। গ্রীসের অন্য নগররাষ্ট্রগুলি একত্র মিলিত হয়ে গ্রীসে রোমকদের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারাও যুদ্ধে পরাজিত হলে গ্রীসের সর্বত্র রোমান আধিপত্য আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

অনুশীলনী

১। ক্রীট কোথায়? গ্রীকদের ওপর ক্রীটের কি প্রভাব পড়েছিল?

২। হোমার কে ছিলেন? তিনি কি জন্য বিখ্যাত?

৩। হোমারের রচনা থেকে গ্রীক চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কি জানতে পারি?

৪। কয়েকজন গ্রীক দেবদেবীর নাম কর।

৫। গ্রীসে নগররাষ্ট্র কিভাবে গড়ে উঠেছিল? নগররাষ্ট্রগুলি কিভাবে শাসিত হোত?

৬। কিসের তাগিদে গ্রীকরা উপনিবেশ স্থাপন করতে বেরিয়েছিল? উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে কি ধরনের জায়গা তারা খুঁজেছিল?

৭। এথেন্সে শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা কি ধরনের ছিল?

৮। এথেন্সে রাজা কিভাবে দেশ শাসন করতেন?

৯। স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থা কি রকম ছিল?

১০। স্পার্টার জনপ্রিয়তা হানি ও এথেন্সের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ কি?

১১। স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার নাম কি? এই যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

১২। এথেন্সের শিল্পী ও নাট্যকারদের পরিচয় দাও।

১৩। টীকা লিখঃ

পেরিক্লিস, সফোক্লিস, সক্রেটিস, হেরোদোতাস।

১৪। আলেকজাণ্ডার কে ছিলেন? তাঁর ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও।

১৫। অশুদ্ধি সংশোধন করঃ—

(ক) গ্রীকদের সূর্য দেবতার নাম জিউস।

(খ) লাইকারগাস ছিলেন এথেন্সের একজন শাসনকর্তা।

(গ) হেরোদোতাস ছিলেন একজন বিখ্যাত গ্রীক নাট্যকার।

(ঘ) ইস্কাইলাসের বিখ্যাত নাটকের নাম আন্তিগোনে।

(ঙ) সত্যের জন্য সফোক্লিস কারাগারে বিষপান করে প্রাণ বিসর্জন দেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রোম

রোম নগরীর জন্মকথা

ইউরোপের মানচিত্রের দিকে একবার তাকাও। দেখবে, গ্রীসের পশ্চিমে ইতালি দেশ। আকৃতি দেখে মনে হবে, ভূমধ্যসাগরে কে যেন একটা প্রকাণ্ড পা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে টাইবার নদী। তারই তীরে রোম নগর। টাইবার নদীর ধারে সাতটি পাহাড়ের ওপরে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল রোম নগর। গল্পে আছে, রোমুলাস ও রেমাস নামে দুই ভাই এই নগরটি গড়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন রণদেবতা মার্স-এর যমজ পুত্র।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। তখন রোম ছিল সামান্য একটা বাণিজ্য-নগর। গ্রীসের পতনের পর এই রোমই হয়ে উঠেছিল ইউরোপের সভ্যতার কেন্দ্র। রোমে আগে রাজার শাসনই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এট্রুস্কান নামে এক জাতি তখন রোমে রাজত্ব করত। কিন্তু সেই রাজারা অত্যাচারী হয়ে উঠলে প্রজারা বিদ্রোহ করে রাজাকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর থেকে রোমে আর রাজার শাসন রাখা হোল না। শাসনভার দেওয়া হোল দুজন নগরবাসীর ওপর। তাঁদের উপাধি হোল কন্‌সাল। ইতালির বিভিন্ন প্রদেশে ছিল তখন নানাজাতির বাস। তারা বার বার আক্রমণ করে রোমকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এই সব জাতিকে দমন করতে রোমকে প্রায় দু'শ বছর ধরে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তারপর ইতালির প্রায় সব অঞ্চল জয় করে রোম খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

রোম বনাম কার্থেজ

ইতালির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের অপর তীরে আফ্রিকা। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে কার্থেজ নগর। আগেই ফিনিশিয় জাতি এখানে একটা শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেছিল। রোম দিনে দিনে বাড়ছে, কার্থেজের এটা খুবই বিপজ্জনক বলে মনে হোল। আর এদিকে রোম দেখল—সমস্ত ভূমধ্যসাগর জুড়ে বসে রয়েছে কার্থেজ। ইতালির দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপ, সেখানেও কার্থেজের আধিপত্য। রোম কি কোণঠাসা হয়ে বসে থাকবে? সাগরের একদিকে কার্থেজ, অপর দিকে রোম। সমুদ্রের আধিপত্য কে করবে? তাই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল।

স্থলযুদ্ধে রোম ছিল অতুলনীয়, কিন্তু জলযুদ্ধে কার্থেজের জুড়ি আর কেউ ছিল না। কাজেই যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করে রোম জলযুদ্ধেও শক্তিশালী হয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। রোমের সঙ্গে কার্থেজের তিন তিনবার যুদ্ধ হয়েছিল। ইতিহাসে এর নাম পিউনিক যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধে শেষ-পর্যন্ত কার্থেজের যখন পরাজয় ঘটল, তখন উভয় পক্ষে সন্ধি হোল।

কিন্তু হেরে গিয়ে কার্থেজ কি চুপ করে বসে রইল? রোমও নিশ্চিন্ত ছিল না। ভেতরে ভেতরে দু'পক্ষই শক্তি সঞ্চয় করে চলছিল। ফলে আবার যুদ্ধ বাধল।

কার্থেজের একজন নামকরা সেনাপতি ছিলেন হামিলকার বার্কা। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন রোমের ওপর পরাজয়ের প্রতিশোধ তিনি নেবেনই। কিন্তু অকালে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর তরুণ পুত্র হানিবল তখন পিতার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে এগিয়ে এলেন। সৈন্যদলকে আরও শক্তিশালী করে তিনি রোম জয় করতে বেরিয়ে পড়লেন। ইতালির উত্তরে বরফ-ঢাকা বিশাল আল্পস্ পর্বত। সেই পাহাড় পার হতে গিয়ে তাঁর বহু সৈন্য ও হাতী ঘোড়া প্রাণ হারাল। তারপর তিনি এসে পৌঁছলেন ইতালিতে। হানিবল ইতালিতে দীর্ঘ পনের বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। প্রতি যুদ্ধেই তাঁর জয় হতে থাকে। একসময়ে মনে হয়েছিল রোম বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু রোমান জাতি হার মানল না। তারা সামনাসামনি যুদ্ধে না পেরে শুরু করল আড়াল-যুদ্ধ। আজ এখানে, কাল ওখানে---এইভাবে তারা জায়গায় জায়গায় হঠাৎ আক্রমণ করে শত্রুপক্ষের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সব কেড়ে নিতে লাগল। এই সময় রোমানদের একটি দল হঠাৎ গিয়ে হানা দিল কার্থেজে। এই দলের নেতা ছিলেন সিপিও। বিপদে পড়ে কার্থেজের কর্তারা হানিবলকে ইতালি থেকে ডেকে পাঠালেন। হানিবল তাড়াতাড়ি রোম ছেড়ে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। পথে সিপিওর সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হোল। এইবার তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। নিরুপায় হয়ে কার্থেজ অপমানজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করল।

হানিবল

কিন্তু এইখানেই শেষ হ'ল না। কার্থেজ তখনও টিঁকে রয়েছে এটা রোমের সহ্য হোল না। রোম তখন এক মিথ্যা অজুহাতে কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। কার্থেজ আর রক্ষা পেল না। রোমান সেনারা নগরটি ভেঙ্গেচুরে একেবারে তছনছ করে দিল। কার্থেজ ধ্বংস হওয়ায় রোমকে বাধা দেবার মত আর কোন জাতই রইল না। ভূমধ্যসাগরের তীরভূমি অঞ্চলে রোম হয়ে উঠল একচ্ছত্র অধিপতি।

প্রাচীন রোমের সমাজ

প্রাচীন রোমের সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়, সাধারণ নাগরিক আর গোলাম—এই তিন শ্রেণীর মানুষ বাস করত। দেশ থেকে রাজার শাসন উঠে যাবার পর রোমের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। দেশ জুড়ে দেখা দেয় বেকার সমস্যা। দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষই কেবল প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করত। তাদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকেরা ছিল খুবই গরীব। তারা কুঁড়ে ঘরে বাস করত। চাষ-বাস ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। যুদ্ধের সময়ে এদেরই ডাক পড়ত দেশের হয়ে যুদ্ধ করার জন্যে। কিন্তু সে জন্যে তারা কোন বেতন পেত না। অভিজাত সম্প্রদায় অর্থাৎ ধনীদের চোখে এরা ছিল অতিশয় হীন ও অধম। রোমের জাঁকজমক ও বিলাসিতা—সব কিছুরই মূলে ছিল গোলাম শ্রেণীর মানুষের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তাছাড়া তারা মনিবের সেবা করত, ক্ষেত খামারের কাজেও তারা খাটত। কিন্তু তাদের অবস্থা ছিল পশুরও অধম।

পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান

রোমে যখন রাজার শাসন চালু ছিল তখন রাজকার্যের জন্যে নিযুক্ত ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকর্মচারী। এই সব রাজকর্মচারীরা দেশের সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধে ভোগ করত। এই ভাবে দেশের মধ্যে এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হোল। এদের বলা হ'ত পেট্রিসিয়ান। আর সাধারণ মানুষ যারা এইসব বিশেষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল তাদের বলা হোত প্লেবিয়ান। গণতন্ত্রের যুগেও দেখা গেল এই পেট্রিসিয়ানরাই হয়ে উঠেছে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কন্‌সাল, ম্যাজিস্ট্রেট, পুরোহিত প্রভৃতি দেশের সব উঁচু পদেই তাদের যেন একচেটিয়া অধিকার। অথচ দেশের জন-সংখ্যার অধিকাংশই হচ্ছে প্লেবিয়ান। তাদের মধ্য থেকে কাউকেই ঐ সব উচ্চপদে নিযুক্ত করা হোত না। ফলে পেট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে প্লেবিয়ানদের একটা চাপা আক্রোশ ক্রমেই ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল।

অথচ এই প্লেবিয়ানদের না হলে পেট্রিসিয়ানদের চলে না। যুদ্ধের সময়ে তারাই দেশের হয়ে যুদ্ধ করে, শান্তির সময়ে তাদের পরিশ্রমেই চলে দেশ গড়ার কাজ। তাই পেট্রিসিয়ানদের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যে তারা আশ্রয় নিল ধর্মঘটের। মাঝে মাঝেই তারা পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকত অন্য কোন জায়গায়। তখন তাদের আবার সাধ্য-সাধনা করে ডেকে নিয়ে আসতে হোত পেট্রিসিয়ানদের। ক্রমে চাপে পড়ে ধীরে ধীরে পেট্রিসিয়ানরা মেনে নিতে লাগল প্লেবিয়ানদের বিভিন্ন দাবী। প্রথমে সৃষ্টি হ'ল ট্রিবিউন পদের। ট্রিবিউন ছিল অনেকটা উকিলের মত। তাদের কাজ ছিল পেট্রিসিয়ানদের অন্যায় অবিচারের হাত থেকে প্লেবিয়ানদের রক্ষা করা। তারপর তৈরী হ'ল প্লেবিয়ানদের নিজস্ব নাগরিক সভা। পরে যখন অন্য সব ব্যাপারেও পেট্রিসিয়ানদের সঙ্গে প্লেবিয়ানদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়ে গেল তখনই অবসান ঘটল এই শ্রেণীসংগ্রামের।

রোমের নাগরিকত্ব

আমরা দেখেছি রোমে রাজার শাসন শেষ হয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র। তোমরা জান গণতন্ত্র বলতে বোঝায় প্রজাদের শাসন। সেখানে শাসনক্ষমতা কোন একজনের হাতে থাকে না। প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সবাই মিলেমিশে দেশ শাসন করে। তাই গণ-তান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি। রোমে নাগরিকদের দুটি সভা ছিল। একটা **সাধারণ সভা** আর অপরটির নাম **সেনেট**। নাগরিকরা এই সভার সভ্যদের নির্বাচিত করত। নাগরিকদের সকলের কিন্তু ভোটদানের অধিকার ছিল না। যাদের কিছু-না-কিছু সম্পত্তি আছে তারাই কেবল ভোট দিতে পারত। রোমের নাগরিকরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখত কোন একজনের হাতে যেন বেশি ক্ষমতা না থাকে। একজনের হাতে বেশি ক্ষমতা থাকলেই সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। তাই শাসনক্ষমতা তারা ভাগ করে দিয়েছিল অনেকের মধ্যে। কেউই একটানা বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারত না। কন্‌সাল, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি উঁচুপদের লোকদের মাত্র একবছরের জন্যে নিয়োগ করা হোত।

দাসত্ব ও দাসবিদ্রোহ (স্পার্টাকাস)

একদিন রোম ছিল সামান্য একটা নগর। কালে এই সামান্য রোমই হয়ে উঠল মস্ত বড় রোম সাম্রাজ্য। ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া—এই তিন মহাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল এর বিশাল সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্য থেকে রোমে আমদানি হতে লাগল প্রচুর অর্থ আর সেই সঙ্গে ক্রীতদাস। রোমের বড় লোকেরা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিল। প্রত্যেকের ঘরেই অসংখ্য ক্রীতদাস মনিবের সেবায় দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছে। রোমানরা যোদ্ধার জাত। তাই তাদের খেলা-ধুলো, আমোদ-প্রমোদের মধ্যে মজার চেয়ে নিষ্ঠুরতা ছিল বেশি। সবচেয়ে নিষ্ঠুর খেলা ছিল গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই। দু'জন ক্রীতদাসকে তরোয়াল হাতে নামিয়ে দেওয়া হোত। দু'জন হানাহানি করে যে জয়ী হ'ত তাকে আবার ফেলে দেওয়া হোত সিংহের সামনে। সিংহের সঙ্গে তার তখন
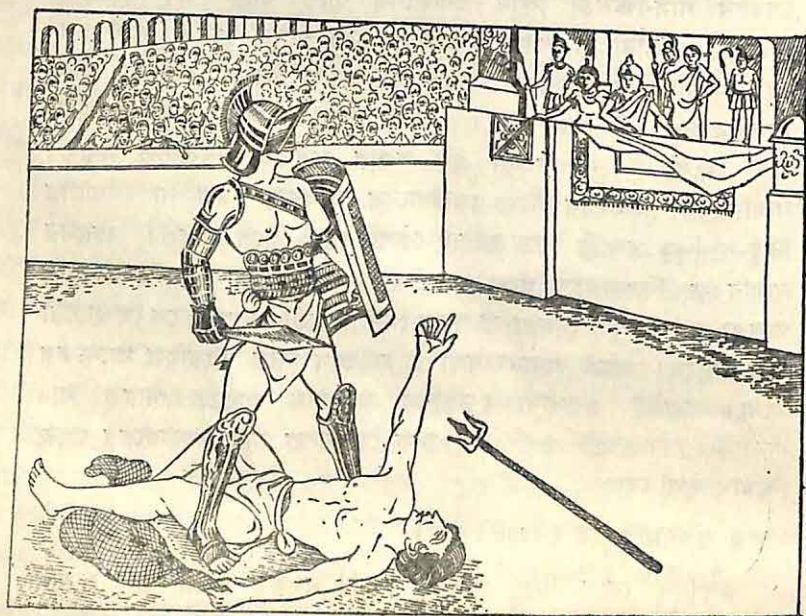
রোমান ক্রীতদাস

গ্লাডিয়েটরের লড়াই

লড়াই চলত। সিংহ যখন সেই রক্তাপ্লুত লোকটির দেহ ছিঁড়ে খেত তাই দেখে হাজার হাজার দর্শক যেন আনন্দে ফেটে পড়ত। ভেবে দেখ কি অমানুষিক অত্যাচার চালানো হ'ত সে যুগে রোমের ক্রীতদাসদের ওপর।

স্পার্টাকাস

স্পার্টাকাস ছিলেন ঐরকম একজন ক্রীতদাস। প্রথম জীবনে তিনি রোমের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। যুদ্ধে শত্রুদের হাতে তিনি বন্দী হন এবং তারা তখন তাঁকে ক্রীতদাস হিসেবে বেচে দেয়। গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াইয়ের জন্যে কয়েকটি ক্রীতদাসের সঙ্গে স্পার্টাকাসকেও তৈরী করা হচ্ছিল। এই খেলায় নিশ্চিত মৃত্যু জেনে তিনি আরও কয়েকজন ক্রীতদাসের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ভিসুভিয়াস পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও বহু ক্রীতদাস গিয়ে যোগ দিল স্পার্টাকাসের সঙ্গে। একবছরের মধ্যেই প্রায় নব্বই হাজার লোক জুটে গেল তাঁর দলে। রোমের সেনাবাহিনী পর পর দুটি যুদ্ধে স্পার্টাকাসের হাতে পরাজিত হোল। দক্ষিণ ইতালির প্রায় অধিকাংশ রাজ্যই চলে এল স্পার্টাকাসের অধীনে। রোম থেকে দুজন কন্‌সাল সসৈন্যে এসে হাজির হলেন স্পার্টাকাসকে রুখতে। কিন্তু পারলেন না। উভয় কন্‌সালকেই পরাজিত করে স্পার্টাকাস দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললেন আল্পসের দিকে। স্পার্টাকাসের সৈন্যদলের অনেকেই তখন আর ইতালি ছেড়ে যেতে চাইল না। এইরকম অবস্থায় স্পার্টাকাস যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। স্পার্টাকাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটল।

জুলিয়াস সীজার

রোমে গণতন্ত্রের অবসান

তোমরা দেখেছ আগে সমস্ত ইতালি নিয়ে রোম ছিল একটা ছোট্ট রাজ্য। সেনেটের পরামর্শ মত দু'জন কন্‌সাল রোমের শাসনকাজ চালাতেন। ছোট রাজ্যের পক্ষে ঐ ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল। কিন্তু নতুন নতুন রাজ্য জয় করার ফলে দেশের মধ্যে সেনাপতিদের আধিপত্য বেড়ে গেল আর সেই সঙ্গে প্রকৃত শাসনক্ষমতা চলে গেল তাঁদেরই হাতে। এই অবস্থায় সেনাপতিদের কেউ কেউ ভাবলেন রোমের বিশাল সাম্রাজ্য সুশাসনে রাখতে হলে সেই ভার একজন ক্ষমতাশালী নায়ককে দিতে হবে। তাঁর ক্ষমতা থাকবে সেনেট বা কন্‌সালের ক্ষমতার ওপরে।

অসীম ক্ষমতা নিয়ে তখন দেখা দিলেন জুলিয়াস সীজার। তিনি বিপক্ষদলকে পরাস্ত করে রোম সাম্রাজ্যের ডিক্‌টেটর বা সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন। এইভাবে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে রোমে আবার প্রতিষ্ঠিত হ'ল একনায়কতন্ত্র।

জুলিয়াস সীজার

রোমের সাম্রাজ্য

আগেই বলেছি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া—এই তিন মহাদেশেই রোমসাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমে কার্থেজ জয়ের ফলে ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য এবং সিসিলি ও স্পেন দেশ রোমের অধিকারে আসে। তারপর আদ্রিয়াতিক সাগরের তীরে গ্রীস ও ম্যাসিডন, সেখান থেকে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপকূলভাগ, গল দেশ (ফ্রান্স) ও বৃটেন রোম সাম্রাজ্যের অধীন হোল। এইভাবে গ্রীক, ল্যাটিন ও পারসিক—এই তিন প্রাচীন সভ্যতার মিলন ঘটল একই সাম্রাজ্যে।

জুলিয়াস সীজার ছিলেন সুযোগ্য শাসক। রোমের ডিক্‌টেটর হয়ে প্রথমেই তিনি লোভী ও অকর্মণ্য কর্মচারীদের সরিয়ে দিলেন। সেনেটের সভায় তখন গরীব লোকদের স্থান ছিল না। তিনি যোগ্য গরীব লোককেও সদস্য হবার অধিকার দিলেন। তাছাড়া নানাভাবে দেশের মঙ্গলজনক কাজেও সীজার উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর শাসনে দুবছরের মধ্যে দেশে শান্তি ও শৃঙখলা ফিরে আসে। কিন্তু সীজারের আধিপত্য অনেকেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তাই তারা চক্রান্ত করে সীজারকে হত্যা করে।

সীজারের পর তাঁর দত্তক পুত্র অকটেভিয়াস আগস্টাস সীজার উপাধি নিয়ে রোমের সম্রাট হয়ে বসলেন। আগস্টাসের পর যাঁরা রোমের সম্রাট হয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ শাসন কাজে ভালই ছিলেন, আবার অনেকেই ছিলেন অযোগ্য, নিষ্ঠুর ও খামখেয়ালী। সবচেয়ে স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর সম্রাট ছিলেন নিরো। তাঁর জননী ও স্ত্রী উভয়েই তাঁর হাতে নিহত হয়েছিলেন। একবার তাঁর খেয়াল হ'ল রোম নগরে আগুন লাগিয়ে দেখবেন কেমন দেখায়। করলেনও তিনি তাই। লোকের ঘরবাড়ী পুড়ে সর্বনাশ হতে লাগল আর অন্য দিকে দেখা গেল নিরো ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে বীণা বাজাচ্ছেন।

রোম সাম্রাজ্য
কিলোমিটার
0
800
আটলান্টিক মহাসাগর
ব্রিটেন
কলোজেন
গল
স্পেন
রোন নং
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
রোম
পম্পেই
দানিয়ুব নং
ম্যাসিডোনিয়া
এথেন্স
সিসিলি
কার্থেজ
ক্রীট
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
আর্মেনিয়া
এশিয়া মাইনর
টাইগ্রীস নং
মেসোপটেমিয়া
ইউফ্রেটিস নং
সাইপ্রাস
দামাস্কাস
জেরুজালেম
আরব
আলেকজান্দ্রিয়া
মিশর

রোম সাম্রাজ্যের পতন

সীজারের মৃত্যুর পর অকর্মণ্য সম্রাটদের রাজত্বকালে দেশের মধ্যে শুরু হয়েছিল দলাদলি। দূরবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তারা সেই সুযোগে নিজের নিজের এলাকায় হয়ে উঠলেন সর্বেসর্বা। রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম---এই দুটি অঞ্চল দু'জন সম্রাটের অধীনে ভাগ হয়ে গেল। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার ফলে রোমের রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ল। এই রকম অবস্থায় শুরু হ'ল গথ, ভ্যাণ্ডাল, টিউটন প্রভৃতি বর্বর জাতির আক্রমণ। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা দুর্বল রোম সম্রাটের পক্ষে সম্ভব হল না। ফলে ভেঙ্গে পড়ল বিশাল রোম সাম্রাজ্য।

খ্রীষ্ট ধর্মের উদ্ভব

তোমরা জান, রোম সাম্রাজ্য এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব উপকূল জুড়ে ইহুদিদের দেশ। সে দেশও তখন রোমের অধীন। রোমের প্রথম সম্রাট আগস্টাস সীজারের সময়ে বেথেলহেমে যীশুর আবির্ভাব হয়। তাঁর মায়ের নাম মেরী আর বাবার নাম যোশেফ। শোনা যায়, দেবদূত মাতা মেরীকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন---ঈশ্বরের পুত্র তাঁর সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। যীশুর জন্মের সময় আকাশে একটি নতুন তারা উঠেছিল। সেই তারা দেখে কয়েকজন সাধু বুঝতে পেরে-ছিলেন যে, ইহুদিদের প্রাণের রাজা এতদিনে পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁরা এসে যীশুকে প্রণাম করে গিয়েছিলেন। কথাটা দেশের রাজার কানেও পেঁ ৗছল। তিনি দেখলেন কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে তাঁর রাজত্ব আর বেশিদিন থাকবে না। তাই তিনি যীশুর প্রাণবধের সঙ্কল্প করলেন। যীশুর বাবা-মা তখন যীশুকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে গেলেন।

যীশুখীষ্ট

বড় হয়ে তিনি যখন ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন তখন অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি বললেন,---মানুষ একই ঈশ্বরের সন্তান। কাজেই সকল মানুষই সম্পর্কে ভাই ভাই। তাই তিনি বললেন, সকলকে ভালবাসবে, এমন কি শত্রুকেও। মানুষকে ভালবাসলে ভগবান সন্তুষ্ট

হন। শুধু ভালবাসা দিয়েই মানুষ ভগবানকে লাভ করতে পারে। ঈশ্বরের প্রার্থনায় কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই।

সাধারণ মানুষের কাছে যীশুর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে দেখে ইহুদি পুরোহিতরা প্রমাদ গুণল। তারা তখন যীশুকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে বলল যীশু রাজদ্রোহী। পুরোহিতদের কথায় রাজা যীশুকে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করা হোল।

মৃত্যুর পর যীশুর প্রভাব অনেক বেড়ে গেল। তাঁর শিষ্যরা বহু নির্যাতন সহ্য করেও যীশুর বাণী প্রচার করে যেতে লাগল। অবশেষে খ্রীষ্টধর্মের জয় হোল। প্রায় তিনশ' বছর পরে রোম-সম্রাট কন্স্টেন-টাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে খ্রীষ্টধর্মকেই রাজধর্ম বলে ঘোষণা করলেন। আর কোন বাধা রইল না। খ্রীষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

অনুশীলনী

১। কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ বাধার কারণ কি?

২। হানিবল কে ছিলেন? তিনি কিভাবে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন? সেই যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল?

৩। প্রাচীন রোমের সমাজে কত রকমের মানুষ বাস করত? সমাজে ক্রীত-দাসদের অবস্থা কেমন ছিল?

৪। পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান কাদের বলা হোত? তাদের মধ্যে বিরোধের কারণ কি?

৫। দেশ শাসনে রোমের নাগরিকদের কি ভূমিকা ছিল?

৬। স্পার্টাকাস কে ছিলেন? তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন কেন? তাঁর বিদ্রোহের ফল কি হয়েছিল?

৭। গণতন্ত্র কাকে বলে? রোমে গণতন্ত্রের অবসান হোল কেন?

৮। গণতন্ত্রের অবসানের পর রোমের কর্ণধার কে হয়েছিলেন? রোমের জন্যে তিনি কি করেছিলেন?

৯। রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

১০। যীশুখ্রীষ্ট কে ছিলেন? তিনি কোথায় জন্মেছিলেন? যীশুর জন্মের পর কয়েকজন সাধু যীশুকে প্রণাম জানাতে গিয়েছিলেন কেন?

১১। যীশু কি বাণী প্রচার করেছিলেন? তাঁকে মেরে ফেলা হোল কেন?

১২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—

(ক) রোম সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর কে ছিলেন?
(খ) সেই নিষ্ঠুর সম্রাটের নিষ্ঠুরতার একটা পরিচয় দাও।
(গ) গ্লাডিয়েটরের লড়াই কাকে বলে?
(ঘ) কন্সাল কাদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হোত? তাদের কাজ কি ছিল?
(ঙ) সিপিও কে ছিলেন?

চীন

সাঙ্ বংশঃ চীনদেশের ইতিহাসে যে কয়টি প্রাচীন রাজবংশের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সাঙ্ বংশের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে চীনদেশে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের রাজারা দীর্ঘ ৬৪৫ বছর রাজত্ব করে-ছিলেন।

শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাঙ্ বংশের অবদান চীনদেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সুন্দর কারুকার্যকরা ব্রোঞ্জের পাত্র নির্মাণে আর দামী পাথর কাটার মত সূক্ষ্ম কাজে সে যুগের শিল্পীরা ছিল সিদ্ধহস্ত। লেখা আবিষ্কারের আগে মানুষ ছবি এঁকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করত। এই সাঙ্ যুগেই এক নতুন ধরনের লিখনপ্রণালী আবিষ্কৃত হয় যা আগের যুগের লিখন প্রণালীর চেয়ে অনেক সহজ ও সরল। চীনদেশের প্রাচীন কবিতার যে সংকলন আছে তার অনেকগুলিই সাঙ্ আমলের লেখা বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। এই সব কারণেই সাঙ্ যুগকে প্রাচীন চীনদেশের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ বলে মনে করা হয়।

চীনের লিপি

কন্‌ফুসিয়াস

কনফুসিয়াস ছিলেন চীন দেশের ধর্মগুরু। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের দেশে বুদ্ধদেব যখন ধর্মপ্রচার করেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে চীন দেশে ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছিলেন কন্‌ফুসিয়াস।

চীনদেশের তখন বড়ই দুর্দিন। সেখানে তখন ছিল অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য। সেই সব রাজাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকত। সমাজেও প্রবেশ করেছিল নানারকম দুর্নীতি। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের দুঃখ ও অশান্তির আর সীমা রইল না। কন্‌ফুসিয়াসই তখন সাধারণ মানুষের দুর্দশামোচনের পথ খুঁজে বের করলেন।

লেখাপড়ায় তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। অল্পবয়সেই তিনি গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি মানুষকে নীতি-শিক্ষা দিয়ে বেড়াতেন। কন্‌ফুসিয়াসের উপদেশ খুবই সরল ও সকলের

উপযোগী। তিনি বলতেন, চরিত্রবলই মানুষের সবচেয়ে বড় বল। এই চরিত্রবল থাকলে মানুষ সব বিষয়ে উন্নতি করতে পারে এবং দুঃখ-দুর্দশাও এড়াতে পারে। তিনি বলতেন, সংসারে থেকে ধর্ম পালন করবে, পরিবার ও সমাজের উন্নতি বিধান করবে। মানুষ যদি আচার-আচরণে সুনীতি পালন করে তাহলে কারুর আর কোন দুঃখই থাকবে না। তিনি বলতেন, পিতার কর্তব্য যেমন সন্তানকে মানুষ করে তোলা, সন্তানেরও তেমনি কর্তব্য পিতামাতাকে মান্য করা ও তাঁদের সেবা-যত্ন করা। বিপদ-আপদে প্রতিবেশীর সাহায্য করাও মহৎ কাজ। কন্‌ফুসিয়াস যে আদর্শ প্রচার করে গিয়েছিলেন, আজও চীন দেশের লোক তা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলে।

কন্‌ফুসিয়াস

চীন সাম্রাজ্য

প্রাচীন চীন দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সিন্ (Ch'in) নামে ছোট একটি রাজ্য ছিল। চৌ বংশের পতনের পর চীন সাম্রাজ্য তখন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সেই সিন্ রাজ্যের রাজা শক্তি সঞ্চয় করে ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে এক সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। সম্রাট হিসেবে তাঁর উপাধি হোল সিন-সি-হুয়াংতি। সি-হুয়াংতি কথাটির অর্থ হোল প্রথম সম্রাট। তিনি সমস্ত সাম্রাজ্যকে মোট ৩৬টি প্রদেশে ভাগ করে দিয়ে প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্যে একজন করে শাসনকর্তা নিয়োগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে দেশের সর্বত্র একই আইন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একই মাপকাঠি ও ওজনের বাটখারা চালু হোল। এইভাবে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনলেন। শোনা যায়, সেই সময়ে পণ্ডিতদের যে সব লেখা তাঁর মতের সঙ্গে মিলত না সেই সব লেখা বই তিনি নাকি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের যে বনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর পরেই ভেঙে পড়ে।

চীনের প্রাচীর

চীন সম্রাটের আমলে বিভিন্ন বর্বর জাতি প্রায়ই চীন দেশ আক্রমণ করত। তাই তাদের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্যে সি-হুয়াংতি

সীমান্ত বরাবর বিরাট একটা পাঁচিল গেঁথে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই পাঁচিলের অনেকখানি অংশই তাঁর আগের রাজারা বিভিন্ন সময়ে তৈরী করে গিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে বিভিন্ন অংশগুলোকে জুড়ে তিনি
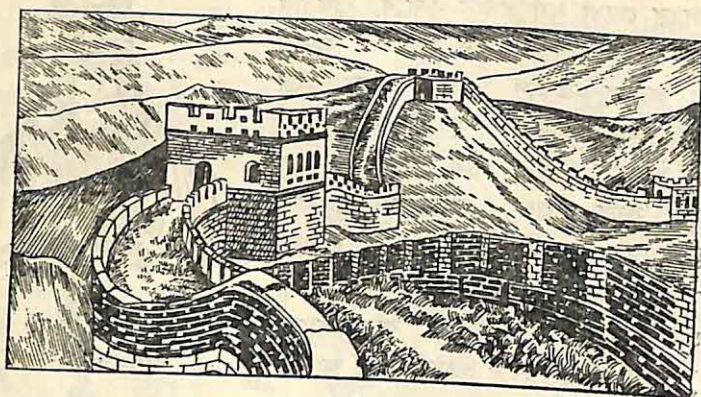
চীনের প্রাচীর

পাঁচিল গাঁথার কাজ শেষ করেছিলেন। চীনের পাঁচিল প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু আর লম্বায় চলে গিয়েছে দেড় হাজার মাইল। পাঁচিলের ওপরে জায়গায় জায়গায় মিনার করা আছে যেখানে পাহারা দেবার জন্যে সৈন্য মোতায়েন করা থাকত। ঐরকম প্রায় কুড়ি হাজার মিনার ছিল সারা পাঁচিল জুড়ে। এক একটি মিনারে সৈন্য থাকত ১০০ জন করে। এতবড় পাঁচিল পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তাই চীনের পাঁচিলকে বলা হয় পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি।

অনুশীলনী

১। কনফুসিয়াস কে ছিলেন? তিনি চীনাদের কি শিক্ষা দিয়েছিলেন?

২। সিন-সি-হুয়াংতি কার উপাধি? কি জন্যে তিনি চীনের ইতিহাসে বিখ্যাত?

৩। চীনের প্রাচীরের বর্ণনা দাও।

৪। চীনের সাঙ যুগকে গৌরবময় যুগ বলা হয় কেন?

নবম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষ

আর্যদের আগমন

আর্যদের যথার্থ পরিচয় কি আর তাদের বাসস্থানই বা কোথায় ছিল তা আজও সঠিকভাবে জানা যায় না। খুব সম্ভব তারা ছিল মধ্য এশিয়া অথবা মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের লোক। উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে তারা প্রথমে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পরে তারা প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

বেদ

আর্যদের কথা জানা যায় তাদের সাহিত্য থেকে। তার নাম বেদ। বেদের চারটি ভাগ আছে—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। প্রত্যেকটি বেদের মধ্যে তিনটি করে অংশ—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ব্রাহ্মণ অংশে আছে কি করে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয় তার বিবরণ। আরণ্যকে আছে অরণ্যবাসী আশ্রমিকদের পথনির্দেশ আর উপনিষদে আছে ভারতীয় দর্শনের আলোচনা।

প্রাচীন আর্য সমাজ

আর্যরা সমাজের যাবতীয় কাজকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। এইভাবে যাদের ওপর যাগ-যজ্ঞ করা ও পূজার্চনার ভার পড়ল তাদের বলা হোত ব্রাহ্মণ। যুদ্ধ-বিগ্রহ করা আর রাজ্য শাসনের ভার পড়ল ক্ষত্রিয়দের ওপর। যারা কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য করত তাদের বলা হোত বৈশ্য। এইভাবে আর্য সমাজ পৃথক্ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। আর্যরা পরাজিত ভারতের আদিবাসীদের নাম দিয়েছিল দাস বা দস্যু। এই অনার্য দাসেরাই সমাজে শূদ্র নামে পরিচিত হয়।

আর্যদের সকলকেই জীবনে চতুরাশ্রম ধর্ম মেনে চলতে হোত। চতুরাশ্রম বলতে বোঝায়—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। লেখা-পড়ার সময়কে বলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম। সংসার ধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের কাজ। প্রৌঢ় বয়সে সংসার ছেড়ে বনগমনকে বলে বাণপ্রস্থ। সব শেষে বৃদ্ধ বয়সে সব কিছু ত্যাগ করে শুধু ভগবানের চিন্তায় দিন যাপনকে বলে সন্ন্যাস।

পিতাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। ছেলে-মেয়ে সকলেই সমানভাবে লেখাপড়া শিখত। অপালা, ঘোষা, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি বহু বিদূষী মহিলার নাম বেদ থেকে আমরা জানতে পারি। আর্যদের খাদ্য ছিল যব, গম, ধান, দুধ ও নানাপ্রকার পশু-পাখীর মাংস। সুরা ও সোমরস ছিল প্রিয় উত্তেজক পানীয়। শিকার, পাশাখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন খেলাধুলো ছাড়াও নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল, যেমন নাচ, গান, বাজনা, অভিনয় ইত্যাদি।

ধর্ম

আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে পূজো করত। সূর্য, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি ছিলেন আর্যদের উপাস্য দেব-দেবী। পরে আর্যরা বুঝেছিল যে, এইসব বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পেছনে আছেন আর একজন যিনি এদের সকলকে চালাচ্ছেন। তাই অসংখ্য দেবদেবীর পূজো করলেও আসলে ঈশ্বর বলতে যে একজনকেই বোঝায় এই ধারণা তাদের মনে তখন থেকেই গেঁথে গিয়েছিল।

রাজনৈতিক সংস্থা

কতকগুলি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম এবং কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি বিশ্ গঠিত হোত। গ্রামের কর্তাকে গ্রামণী আর বিশের কর্তাকে বলা হ'ত বিশপতি বা রাজন্ (রাজা)। রাজার অধীনে থাকত 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুইটি পরিষদ। রাজা তাদের পরামর্শ নিয়ে দেশ শাসন করতেন। বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। অন্য রাজাদের হারিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অনেকে একরাট্ বা রাজচক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করতেন।

মহাকাব্য

বেদের পরবর্তী সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারত। কবি ও কথকরা মুখে মুখে রামসীতা ও পঞ্চপাণ্ডবের কথা গেয়ে বেড়াত। এই দুই মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় জীবনের এক একটি আদর্শ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতে ফুটে উঠেছে দেশ পরিচয়, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপ আর সেই সঙ্গে ভারতীয় জীবনের মহান্ আদর্শ। রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি আর মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস। বাংলায় তা অনুবাদ করেন যথাক্রমে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব

প্রাচীন আর্যদের ধর্ম ছিল সহজ ও সরল। কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের হাতে পড়ে তা হয়ে উঠ্‌ল আড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। ধর্মের নামে শুরু হোল পশুবলির ঘটা। তাছাড়া জাতিভেদ প্রথার মধ্যেও শুরু হোল এমন কড়াকড়ি যে ঐ ধর্মের ওপর অনেকেই আস্থা হারিয়ে ফেলতে লাগল। এই ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে দুই মহাপুরুষ ধর্মের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছিলেন তাঁরা হলেন মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ।

মহাবীর ও জৈনধর্ম

উত্তর বিহারের বৈশালী নগরে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হন ও বার বছর কঠোর তপস্যা করে 'পরম সত্য' লাভ করেন। অহিংসা, সত্যকথা বলা, চুরি না করা, চিন্তা, বাক্য ও কার্যে ন্যায়পরায়ণ হওয়া ও কাহারও দান না লওয়া,—এই পাঁচটি নিয়ম পালন তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল কথা। মহাবীর

মহাবীর

বুদ্ধদেব

সিদ্ধিলাভ ক'রে 'জিন' অর্থাৎ রিপুজয়ী হয়েছিলেন। তাই তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন তার নাম হয় জৈন-ধর্ম। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা জাতিভেদ প্রথা কিছুই মানতেন না। জৈনদের ধর্মগ্রন্থগুলি অঙ্গ, উপাঙ্গ ও মূলসূত্র নামে পরিচিত। অনেকে আবার পার্শ্বনাথকে জৈনধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন।

গৌতম বুদ্ধ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁর বাল্যনাম ছিল সিদ্ধার্থ। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন একটু ভাবুক প্রকৃতির। তিনি সব সময়ে ভাবতেন মানুষের দুঃখের কথা। একদিন রথে চড়ে বেড়াতে বেরিয়ে তিনি দেখলেন এক বৃদ্ধকে। বয়সের ভারে বেচারী নড়তে পারছে না। দেখে খুব কষ্ট হোল সিদ্ধার্থের। আর একদিন দেখলেন এক পঙ্গু রোগী, আর একদিন এক শবদেহ। তিনি সারথির কাছ থেকে জানলেন যে, সব মানুষকেই একদিন এই অবস্থায় পড়তে হবে। শুনে তাঁর মন আরও খারাপ হয়ে গেল। শেষে একদিন দেখা হ'ল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সংসারের দুঃখ-কষ্টের কোন ছাপ পড়েনি সে মুখে। তাই দেখে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের যেন একটা পথ খুঁজে পেলেন সিদ্ধার্থ। অবশেষে একদিন তিনি সংসারের মায়া কাটিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। বহুদিন তপস্যার পর তিনি 'পরম জ্ঞান' লাভ করলেন। তাঁর নাম হোল বুদ্ধ। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে ধর্মপ্রচারের পর আশী বছর বয়সে তিনি কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম

বুদ্ধদেবের মতে মানুষের কামনা-বাসনাই যত দুঃখের কারণ। এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে তিনি কতকগুলি উপায় বলে দিয়ে গিয়েছেন। এগুলিকে বলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ। বুদ্ধদেবের মতে এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে চলাই মানুষের মুক্তি লাভের একমাত্র পথ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে বোঝায় সম্যক্ দৃষ্টি, সৎ সঙ্কল্প, সৎবাক্য, সৎকার্য, সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা, সৎ স্মৃতি ও সৎ সমাধি। বৌদ্ধ ধর্মে দেব-দেবী, যাগযজ্ঞ, বর্ণভেদ, ছোঁয়াছুঁইর বিচার ইত্যাদির কোন স্থান নেই। জীবে প্রেম ও অহিংসাই বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা। বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি যে গ্রন্থে সংকলিত আছে তার নাম ত্রিপিটক।

চন্দ্রগুপ্ত

চাণক্য নামে তক্ষশীলার এক কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন। তিনি ছিলেন মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজা হয়ে দেখলেন যে, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের রাজ্যগুলি আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়েছে আর সেখানে তখন রাজত্ব করছেন আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকস। রাজা হবার পর চন্দ্রগুপ্তের লক্ষ্য হ'ল গ্রীক শাসন থেকে দেশকে উদ্ধার করে সারা উত্তর ভারতে এক সুশাসিত সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। উত্তর ভারতের গ্রীক অধিকৃত

রাজ্যগুলি জয় করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ বাধল গ্রীক সেনাপতি সেলুকসের। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সেলুকসকে কাবুল, কান্দাহার, হীরাট ও বেলুচিস্তান ছেড়ে দিতে হ'ল। এইভাবে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য সারা আর্যাবর্ত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে বিস্তৃত হ'ল। চন্দ্রগুপ্তের পর মগধের সিংহাসনে বসলেন পুত্র বিন্দুসার। তিনি পিতার সাম্রাজ্য অটুট রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অশোক

বিন্দুসারের পর তাঁর পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হবার পর তিনি কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করলেন।

রক্তপাতের বিনিময়ে কলিঙ্গ মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হোল। দূর দক্ষিণের কয়েকটি তামিল রাজ্য ছাড়া সারা ভারতবর্ষে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হোল। কিন্তু ইতিহাসে এই কলিঙ্গ বিজয়ের ফল দাঁড়াল অন্যরকম। এই যুদ্ধ বিজয়ী সম্রাটের মনে জাগিয়ে তুলল এক তীব্র অনুশোচনা। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ফলে তাঁর মনে শান্তি ফিরে আসে। তাই রাজ্যজয়ের বদলে মানুষের হৃদয় জয় করাকেই অশোক জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন। বুদ্ধদেবের অহিংসাবাণীর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন শান্তির পথ। তাই বৌদ্ধধর্মকে তিনি রাজধর্মে পরিণত করেছিলেন।

অশোক

বুদ্ধদেবের বাণী দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দেবার জন্যে নিযুক্ত হোল ধর্ম প্রচারকের দল। সারা রাজ্যে পর্বত ও স্তম্ভগাত্রে তিনি খোদাই করে দিলেন ভগবান বুদ্ধের উপদেশগুলি। এই উপদেশের মর্ম দেশবাসীকে
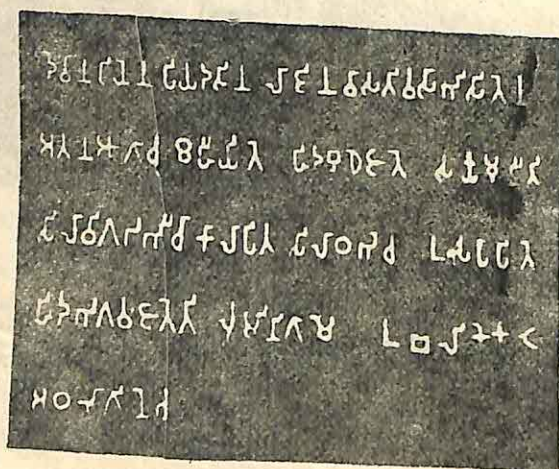
অশোকের শিলালিপি

বোঝাবার জন্যে তিনি নিযুক্ত করলেন ধর্ম মহামাত্র নামে এক বিশেষ শ্রেণীর রাজ-কর্মচারী। যুদ্ধে জয়লাভ করেও যুদ্ধ ত্যাগ করে ধর্মের পথ গ্রহণ করেছেন এমন রাজার দৃষ্টান্ত কোন দেশের ইতিহাসে নেই। তাই অশোক চিরকাল ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

কুষাণ সাম্রাজ্য

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে ইউ-চি নামে এক যাযাবর জাতি অক্ষুনদীর উপত্যকায় বাস করত। এই জাতির একটি শাখার নাম কুষাণ। কুষাণ বংশের প্রথম রাজার নাম কুজুল কদ্‌ফিস। তিনি কাবুল, গান্ধার ও তক্ষশীলা অধিকার করেছিলেন। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম্ কদ্‌ফিস পাঞ্জাব অধিকার করে বারাণসী পর্যন্ত কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

কণিষ্কঃ বিম্ কদ্‌ফিসের পর যিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনিই কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কণিষ্ক। তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে তিনি কাশ্মীর অধিকার করে সিন্ধু ও গঙ্গানদীর উপত্যকায় কুষাণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারপর চীন সম্রাটকে পরাস্ত করে, তিনি কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটান অধিকার করে নেন। কণিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী। তাঁরই চেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের বাইরে আফ্‌গানিস্তান, তুর্কিস্তান, চীন প্রভৃতি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে মতবিরোধ দূর করার জন্য তিনি একটি বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। সেই সম্মেলনে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান—এই দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। কণিষ্ক খুব বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন ও বসুমিত্র, বুদ্ধচরিত রচয়িতা অশ্বঘোষ এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রণেতা চরক তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন। শিল্পের প্রতিও তাঁর ছিল সমান দরদ। কণিষ্কের সময়ে ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে বিদেশী শিল্পধারা মিশে গান্ধার শিল্প নামে এক নতুন শিল্পের জন্ম হয়েছিল।

কনিষ্ক

গুপ্ত সাম্রাজ্যঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লিচ্ছবি বংশের রাজকন্যাকে বিয়ে করে উত্তর ভারতে নিজের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই বিয়ের ফলেই লিচ্ছবি রাজ্য চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে। উত্তর প্রদেশের ত্রিহূত, এলাহাবাদ, অযোধ্যা এবং বিহারের অধিকাংশ অঞ্চল এমন কি বাংলাদেশেরও কিছু

অংশ চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধীন ছিল। এই সব রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

সমুদ্রগুপ্ত ঃ চন্দ্রগুপ্তের পর রাজা হলেন পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। রাজা হবার পর দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে উত্তর ভারতের নয়জন রাজাকে পরাস্ত করে সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের রাজ্য নিজের রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি বেরোলেন দক্ষিণ ভারত অভিযানে। সেখানে পরাজিত রাজাদের

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

রাজ্য তিনি নিজের রাজ্যভুক্ত করে নেননি। তাদের দিয়ে শুধু বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নিয়েই তিনি তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দিগ্বিজয়ের ক্ষেত্রে এই অসাধারণ সাফল্যের জন্যে সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়। দিগ্বিজয় শেষ করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমর্থক হলেও বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের কখনও অনাদর করেননি।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঃ সমুদ্রগুপ্তের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তিনি মালব ও কাথিয়াবাড়ের শক রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে শকদের পরাজিত করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'শকারি' উপাধি লাভ করেন। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ এবং পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন যথাক্রমে কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত। স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্তসাম্রাজ্য আর বেশিদিন টিঁকল না। হূণদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। আবার ভারতবর্ষ কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল।

প্রাচীন বাংলা ঃ আজকের পশ্চিমবঙ্গকে দেখে মনে করো না আমাদের দেশ চিরকালই এতটুকু ছিল। আজ যার নাম বাংলাদেশ সেই গোটা বাংলা দেশটাই ছিল আমাদের দেশের মধ্যে। তারও আগে

আমাদের দেশ ছিল আরও বড়। প্রাচীনযুগে বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমা ছিল উত্তরে হিমালয়, উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার সমভূমি, উত্তর-পশ্চিমে দ্বারবঙ্গ, পূর্বে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুরের অরণ্যময় মালভূমি।

আমাদের বাংলাদেশের উৎপত্তি যে কবে তা কেউ বলতে পারেন না। ফা-হিয়েনের বিবরণ, গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকদের রচনা, জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য, রামায়ণ-মহাভারত এমন কি বেদের মধ্যেও বাংলাদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং ভেবে দেখ কত প্রাচীন দেশের অধিবাসী আমরা বাঙালীরা। তবে ইতিহাস বলতে যা বোঝায় প্রাচীন বাংলা দেশের সে ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। বলা যেতে পারে গুপ্ত যুগ থেকেই বাংলাদেশের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্রপাত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। এইভাবে মগধে যে নতুন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তারও নাম ছিল গুপ্ত বংশ। এই বংশই ইতিহাসে পরবর্তী গুপ্ত বংশ নামে পরিচিত। এই পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের আমলে বাংলা দেশে যাঁরা ছিলেন স্থানীয় শাসনকর্তা তাঁরাই একদিন পরবর্তী গুপ্তসাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই সব স্বাধীন বাঙালী রাজাদের মধ্যে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কই ছিলেন সবচেয়ে নামকরা। শশাঙ্কের আগেও স্বাধীন বাঙালী রাজা হিসাবে আর যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন গোপচন্দ্র, সমাচারদেব ও ধর্মাদিত্য।

গৌড়রাজ শশাঙ্ক ঃ শশাঙ্কের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ প্রথম দিকে তিনিও ছিলেন পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে সামান্য একজন সামন্ত রাজা। গুপ্ত সম্রাট মহাসেন গুপ্তের পতনের পর শশাঙ্ক গৌড়ে স্বাধীন রাজারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ ছিল শশাঙ্কের রাজধানী। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে মগধ রাজ্যও শশাঙ্ক জয় করেছিলেন। অনেকে বলেন, কামরূপের রাজাও নাকি শশাঙ্কের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। কনৌজের মৌখরি বংশীয় রাজারা ছিলেন গৌড়ের চির শত্রু। তাই গৌড়রাজ শশাঙ্ক মৌখরিদের দমন করতে বদ্ধপরিকর হলেন। মালবে তখন রাজত্ব করছিলেন দেবগুপ্ত।

শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দু'জনে মিলে একসঙ্গে কনৌজ আক্রমণ করে বসলেন। তাঁদের আক্রমণে কনৌজরাজ গ্রহবর্মা নিহত হলেন আর তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রী হলেন শত্রুহস্তে বন্দিনী।

রাজ্যশ্রী ছিলেন আবার থানেশ্বরের রাজকন্যা অর্থাৎ থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনের ভগ্নী। ভগ্নীর বিপদের খবর পেয়ে রাজ্যবর্ধন সৈন্য সামন্ত নিয়ে ছুটে এলেন কনৌজে। তিনি এসে মালবের রাজা দেবগুপ্তকে পরাজিত করলেন বটে কিন্তু ফেরার পথে এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হলেন। অনেকে মনে করেন এই হত্যার পেছনে শশাঙ্কের হাত ছিল। যাই হোক দেবগুপ্তের সাহায্যে কনৌজ জয় করলেও শশাঙ্ক কিন্তু বেশিদিন তা নিজের অধিকারে রাখতে পারেননি।

রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই হর্ষবর্ধন রাজা হয়ে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলেন। শশাঙ্ককে দমন করবার জন্যে তিনি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। হর্ষের সঙ্গে শশাঙ্কের যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে হর্ষ যে শশাঙ্কের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে পারেননি একথা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা চলে। কারণ শশাঙ্ক যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনি স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করে গিয়েছেন। আনুমানিক ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগঃ তুর্কিস্তান ও তিব্বত নিয়ে যে অঞ্চল তাকেই বলে মধ্য এশিয়া। মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহু দিনের। তোমরা আগেই পড়েছ কণিষ্ক মধ্য এশিয়ার কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি রাজ্য জয় করেছিলেন। তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় এই সব দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ। শুধু তাই নয় পরস্পর মেলামেশার ফলে ভারতীয় সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রহণ করতে লাগল ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা। গুপ্তযুগে পূর্ব তুর্কিস্তানে বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাবাপন্ন রাজ্য ছিল। সেগুলি গোবি মরুভূমির বালির নীচে চাপা পড়ে যায়। সম্প্রতি ঐ সব অঞ্চলে বালির নীচে থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু মঠ, মন্দির, স্তূপ ও ভারতীয় পুঁথি। জানা গেছে এই অঞ্চলের মানুষের ভাষা ছিল তখন সংস্কৃত। খোটান ও কুচি নামে দুটি রাজ্যই ছিল মধ্য এশিয়ার ভারতীয় সভ্যতার বড় কেন্দ্র। খোটানে অনেক বড় বড় বৌদ্ধ বিহার ছিল। তারই একটিতে ভারতে আসার পথে ফা-হিয়েন কিছুদিন বাস করেছিলেন। কুচিতেও অনেক বৌদ্ধস্তূপ ও ভারতীয় মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। কুচির অধিবাসীরা ভারতীয় সঙ্গীত খুব পছন্দ করত। মনে হয় সেখান থেকেই ভারতীয়

সঙ্গীত চীন দেশে প্রচলিত হয়েছিল। সে যুগের বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত এই কুচিতেই বাস করতেন।

ভারত থেকে তুর্কিস্তান দিয়ে চীন যাবার পথে পড়ে তিব্বত। হর্ষবর্ধনের সময়ে সেখানে রাজত্ব করতেন স্রং-সান্-গাম্পো। তিনিই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় বর্ণমালার প্রচলন করেছিলেন। তিব্বতের লামারা নালন্দা ও বিক্রমশীলের মঠে এসে লেখাপড়া ও ধর্মচর্চা করতেন। বাঙালী ভিক্ষু দীপঙ্কর সেখানে গিয়ে বৌদ্ধ সংঘ ও মঠের অনেক সংস্কার করেন। তিব্বতে ভারতের ইতিহাস, ধর্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক পুঁথি আছে। তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ব্যবসার সম্পর্কও অনেক দিনের। তারা তাদের দেশ থেকে সোহাগা আর চামর নিয়ে আসত আমাদের দেশে বিক্রী করতে। বিনিময়ে তারা এখান থেকে নিয়ে যেত যা তাদের দেশে মোটেই পাওয়া যায় না।

বিদেশী ভ্রমণকারীর দৃষ্টিতে ভারত

মেগাস্থিনিস ঃ সেলুকস তাঁর রাজসভা থেকে একজন গ্রীক দূতকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় পাঠিয়েছিলেন। তাঁরই নাম মেগাস্থিনিস। তিনি ভারতবর্ষে এসে যা দেখেছিলেন তার বিবরণ লিখে গিয়েছেন ইণ্ডিকা গ্রন্থে। এই বইটি মৌর্যযুগের ইতিহাসের একটি মূল্যবান উপাদান।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি কৃষি ও পশু-পালন ছিল সে যুগের মানুষের প্রধান উপজীবিকা। জমিতে জলসেচেরও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। কৃষি ছাড়াও মেগাস্থিনিস সে যুগে শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করেছিলেন। বহু লোক শহরে বাস করলেও, শহরের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। সাধারণ মানুষ গ্রামেই বাস করত। তাদের খাওয়াপরার কোন অভাব ছিল না।

মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, পেশা অনুযায়ী তখন ভারতবর্ষে সাত শ্রেণীর মানুষ বাস করত। তারা হ'ল—দার্শনিক, কৃষিজীবী, পশুপালক, বণিক, সৈনিক, পরিদর্শক ও অমাত্য। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, ভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ হ'ত না, আর এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর বৃত্তি গ্রহণ করতে পারত না। মৌর্য সমাজে মেয়েদের মর্যাদা ক্রমেই কমে আসছিল। বিয়ের পর মেয়েদের বিশেষ কোন স্বাধীনতা থাকত না। পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিসের মতে ভারতের জনসাধারণ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করত। তাদের নৈতিক চরিত্রেরও তিনি খুব প্রশংসা করেছেন।

ফা-হিয়েন ঃ গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন নামে এক চীন পরিব্রাজক বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে অনেক মরু পর্বত পার হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে তিনি যা দেখেছেন তাই তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাই ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে ফা-হিয়েনের বিবরণ খুব মূল্যবান।

তিনি বলেছেন জনসাধারণের বিশেষ করে নগরবাসীদের অবস্থা তখন ছিল বেশ স্বচ্ছল। নগরে দানশীল ধনী ব্যক্তির অভাব ছিল না। দেশের সাধারণ মানুষ ছিল সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। তাই দেশে চুরি-ডাকাতির উপদ্রব ছিল না বললেই চলে। একমাত্র চণ্ডাল ছাড়া আর সকলেই সাধারণত নিরামিষ আহার গ্রহণ করত। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের লোকদের মধ্যে ছিল অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক। দেশে জীবন যাত্রার ব্যয় খুব বেশি ছিল না। বিয়েতে পণ প্রথার প্রচলন ছিল। মেয়েদের পণ দিয়ে পাত্রস্থ করতে হোত। পুরুষরা একাধিক বিয়ে করতে পারত, কিন্তু বিধবারা আর বিয়ে করতে পারত না। বিধবাদের কঠোরভাবে জীবন কাটাতে হোত। দীর্ঘ ১৫ বছর ভারতে থাকার পর ফা-হিয়েন বাংলাদেশের তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে জলপথে সিংহল হয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি

শিল্প ও চারুকলা ঃ চিত্রকলা ও ভাস্কর্য শিল্পে প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। হায়দ্রাবাদে অজন্তা-গুহার গায়ে সে যুগের শিল্পীরা এঁকেছেন জীবজন্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের আলেখ্য। এর অনেক ছবিই রঙীন। শিল্পীর নিপুণ হাতের তুলির টানে প্রতিটি ছবিই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভাস্কর্য শিল্প অর্থাৎ পাথরের মূর্তিগড়ার কাজেও শিল্পীরা পিছিয়ে ছিলেন না। প্রাচীন ভারতে তৈরী অনেক পাথরের মূর্তি মুসলমান আক্রমণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবু যা আছে তাদের মধ্যে ঝাঁসীর দেওগড় মন্দিরের বিষ্ণুর অনন্তশয্যা ও মহাযোগী শিবের মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারনাথের বুদ্ধমূর্তি ও সাঁচীর স্তূপে পাথরের কাজও অপূর্ব। তাছাড়া মথুরায় পাওয়া গিয়েছে বুদ্ধদেবের অনেকগুলি ধাতু ও পাথরের তৈরী সুন্দর মূর্তি। ইলোরার বিখ্যাত কৈলাস মন্দির নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগের ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সাহিত্য ঃ গুপ্ত যুগকে বলা হয় সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। এই যুগেই মহাকবি কালিদাস মেঘদূতম্, রঘুবংশম্ প্রভৃতি কাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ প্রভৃতি নাটক লিখে সংস্কৃত সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে হরিষেণ, বীরসেন, ভারবি প্রভৃতি ছিলেন খ্যাতনামা। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস ও শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক—দুটি বিখ্যাত নাটক। 'পঞ্চতন্ত্রম্' নামক গল্পগুচ্ছের রচয়িতা বিষ্ণুশর্মার খ্যাতি আজও অটুট আছে।

মা ও ছেলে

বিজ্ঞান ঃ শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে সমান তালে অগ্রসর হয়েছিল বিজ্ঞানের গবেষণা। গণিতে দশমিক ভগ্নাংশের আবিষ্কার হয় এই যুগেই। সবচেয়ে বেশি উন্নতি দেখা যায় জ্যোতির্বিদ্যায়। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদের নাম আর্যভট্ট। চন্দ্র ও পৃথিবীর আড়াল পড়লে সূর্যে ও চন্দ্রে গ্রহণ লাগে, পৃথিবী দিনে এক পাক করে ঘোরার ফলে দিন ও রাত্রি হয়—এ সবই আর্যভট্টের আবিষ্কার। এই যুগে আর একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদের নাম বরাহমিহির। আয়ুর্বেদশাস্ত্র অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রে ভারত ছিল গ্রীক ও আরবদের গুরু। প্রাচীন ভারতে এই শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন চরক ও সুশ্রুত। তাঁরা ছিলেন কুষাণ আমলের লোক। গুপ্ত যুগে ধন্বন্তরীও ছিলেন একজন নামকরা চিকিৎসক। ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচারও চলত। আজকালকার মত সেই যুগেও মড়া কেটে ছাত্রদের অস্ত্রোপচার শেখানো হোত। পশুচিকিৎসার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা এবং হাসপাতাল ছিল। প্রাচীন ভারতে রসায়নশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ্ ছিলেন নাগার্জুন। তিনি গাছগাছড়ার সঙ্গে পারদ, গন্ধক প্রভৃতি বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য

মিশিয়ে অনেক নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সব ওষুধের মধ্যে স্বর্ণসিন্দূর, রসসিন্দূর, মকরধ্বজ আজও কবিরাজী চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

শিক্ষা ঃ এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্যে প্রাচীন ভারতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। দেশের নামকরা সব পণ্ডিতেরা সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই বহু বিদেশী ছাত্রও আসত এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল তক্ষশীলা ও নালন্দা।

তক্ষশীলা ঃ ভারতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে পড়ানো হোত। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আবাসিক। গুরু ও শিষ্য একসঙ্গে বাস করার জন্যে উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠ্‌ত একটা সুন্দর সম্পর্ক। আলোচনার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা জ্ঞান লাভ করত। বিখ্যাত পণ্ডিতেরা পড়াতেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁদের টানেই ছাত্ররা আসত এখানে। জ্ঞান অর্জন করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই পরীক্ষার কোন বালাই ছিল না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে পড়া বা থাকা-খাওয়ার জন্যে কোন খরচই লাগত না ছাত্রদের। দেশের রাজাই সব ব্যয় বহন করতেন। রাজগৃহের শল্য চিকিৎসক জীবক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেছিলেন। ব্যাকরণের বিখ্যাত পণ্ডিত পাণিনি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

নালন্দা ঃ হর্ষবর্ধনের সময়ে মগধের নালন্দা ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশবিদেশ থেকে প্রায় দশহাজার ছাত্র এখানে থেকে পড়াশুনা করত। দর্শন, সাহিত্য, তর্কবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের নানা বিষয় এখানে পড়ানো হোত। এখানকার অধ্যাপকদের খ্যাতি ও সম্মান ছিল জগৎজোড়া। এখানে সবাই পড়বার সুযোগ পেত না। অধ্যাপকদের কাছে পরীক্ষা দিয়ে তবে ভর্তি হতে হোত এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এখানে পড়াশুনার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। দিনরাত চলত পড়াশুনা আর আলোচনা। চীন, পারস্য, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্র আসত নালন্দায়। নালন্দার উপাধির খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। ছাত্র ও অধ্যাপকরা একসঙ্গে বিদ্যালয়ে বাস করতেন। ছাত্রদের কঠোর

নিয়মশৃঙখলা মেনে চলতে হোত। কাউকে বেতন দিতে হোত না। রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের দানেই সব খরচা চলত।
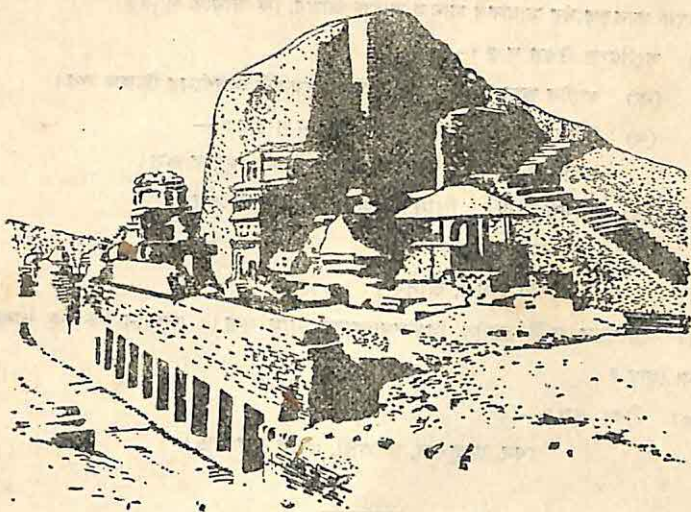
নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

অনুশীলনী

১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কাদের বলা হোত?

২। চতুরাশ্রম বলতে কি বোঝায়?

৩। আর্যদের ধর্ম কি ছিল?

৪। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের কারণ কি?

৫। জৈন ধর্মের মূল কথা কি?

৬। বুদ্ধদেব কি উপদেশ দিয়েছিলেন?

৭। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তিনি কিভাবে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন?

৮। কার সময়ে কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিল? কলিঙ্গ যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল?

৯। কুষাণ কারা? ঐ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে?

১০। সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ান বলা হয় কেন?

১১। গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালের পরিচয় দাও।

১২। অতীতে তুর্কিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে যোগাযোগ ছিল তার পরিচয় আমরা পাই কি করে?

১৩। তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৪। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন? তিনি ভারতবর্ষের সমাজ সম্বন্ধে কি বলে গেছেন?

১৫। ফা-হিয়েন কোথাকার লোক? তিনি কোন্ সময়ে ভারতে আসেন? তাঁর লেখা থেকে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে আমরা কি জানতে পারি?

১৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের কয়েকটি নিদর্শনের উল্লেখ কর।

(খ) নিম্নলিখিত বইগুলির রচয়িতার নাম কর :—
মালবিকাগ্নিমিত্রম্, মৃচ্ছকটিক, রঘুবংশম্, মুদ্রারাক্ষস।

(গ) আর্যভট্ট কে? তিনি কি আবিষ্কার করেছিলেন?

(ঘ) কি জন্য বিখ্যাত?
পাণিনি, চরক, জীবক।

১৭। ভারতের দু'টি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর। সেখানে কি কি বিষয় পড়ানো হোত?

১৮। টীকা লিখ :—

বেদ, সেলুকস, রাজ্যশ্রী, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।